প্রথম আলো

ইউক্রেনকে ছাড় দেবে না রাশিয়া

যুদ্ধবিরতির আলোচনা

ট্রাম্প বলেন, অগ্রগতি হচ্ছে এবং মস্কো ছাড় দিচ্ছে। রাশিয়ার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ বলছেন, কোনো ধরনের ছাড় নয়।

রয়টার্স, *মস্কো*

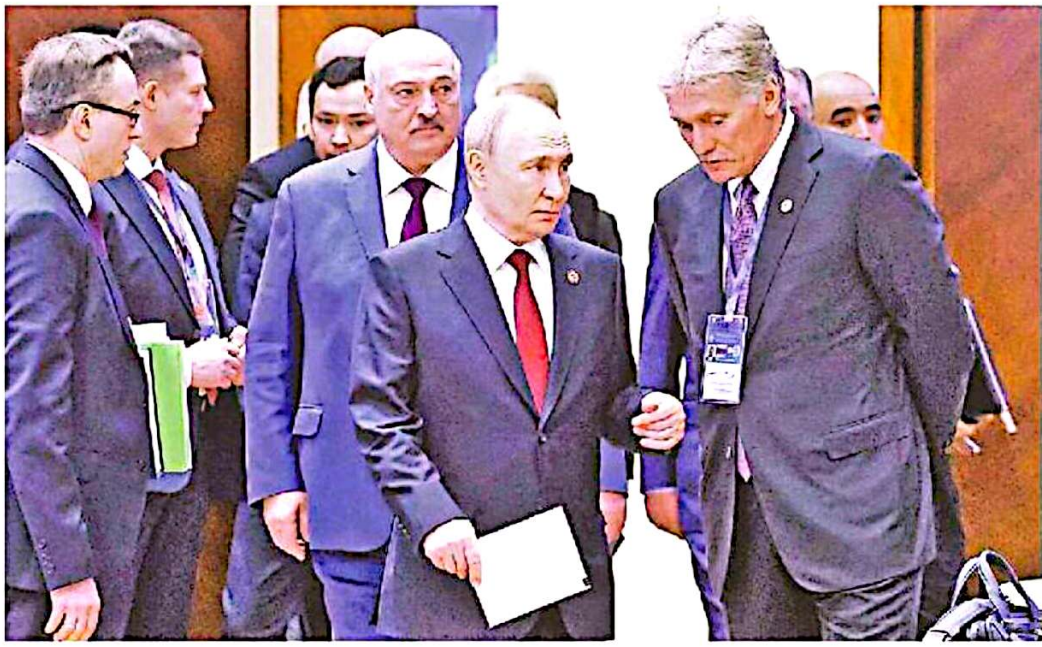

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের সঙ্গে কথা বলছেন। গতকাল কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে এক সম্মেলনে। ছবি : এএফপি

ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে শান্তি পরিকল্পনায় রাশিয়া বড় ধরনের কোনো ছাড় দেবে না। দেশটির জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক ইউরি উশাকভ গত বুধবার এ মন্তব্য করেছেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে ইউরি উশাকভের টেলিফোনে আলাপের নথি ফাঁস হয়। ওই আলাপে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে কীভাবে প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে, সে বিষয়ে মস্কোকে পরামর্শ দিয়েছেন উইটকফ।

আগামী সপ্তাহে জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মস্কো সফর করার কথা রয়েছে উইটকফের। তিনি সেখানে গিয়ে চার বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ২৮ দফা পরিকল্পনা সামনে এনেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে রাশিয়া। তবে ট্রাম্পের পরিকল্পনা সংশোধন-পরিমার্জন করে আরেকটি প্রস্তাব এনেছে ইউক্রেন ও তাদের ইউরোপীয় মিত্ররা।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও গত মঙ্গলবার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত কাঠামো এগিয়ে নিতে তিনি প্রস্তুত। তবে বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে চান। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় মিত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

ট্রাম্পের প্রস্তাব ও উইটকফের ফাঁস হওয়া ওই ফোনালাপ ঘিরে ট্রাম্পের নিজ দল রিপাবলিকানদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা চলছে। আইনপ্রণেতা ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক কৌশল পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উইটকফের ফোনকলকে বড় সমস্যা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের হাস্যকর পার্শ্বনাটক ও গোপন বৈঠক বন্ধ হওয়া দরকার।

রিপাবলিকান সাবেক সিনেটর মিচ ম্যাককনেল বলেন, রাশিয়াকে কোনোভাবেই পুরস্কৃত করা উচিত নয়। সমালোচনা সত্ত্বেও ট্রাম্প বলেন, অগ্রগতি হচ্ছে এবং মস্কো ছাড় দিচ্ছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেও রাশিয়ার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ বুধবার মস্কোতে সাংবাদিকদের বলেন, 'মূল বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ছাড় বা আমাদের অবস্থান থেকে সরে আসার প্রশ্নই ওঠে না।'

নথি ফাঁস

ব্লুমবার্গ নিউজে উইটকফ ও পুতিনের পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভের মধ্যকার একটি ফোনালাপের নথি ফাঁস হওয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মস্কো। ওই ফোনালাপে মার্কিন দূত উইটকফ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে কীভাবে একটি শান্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে উশাকভকে পরামর্শ দেন। তবে এ নিয়ে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা উড়িয়ে দেন। মস্কো বলেছে, এই নথি ফাঁস শান্তি প্রচেষ্টা ব্যাহত করার একটি অগ্রহণযোগ্য চেষ্টা এবং এটি হাইব্রিড যুদ্ধের শামিল।

শান্তিচুক্তি নিয়ে কথা বলার সময় আসেনি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর দূত উইটকফ ও জামাতা জ্যারেড কুশনার আলোচনা করবেন। রুশ কূটনীতিক উশাকভ বলেছেন, 'উইটকফের বিষয়ে আমি বলতে পারি, প্রাথমিকভাবে একটি সমঝোতা হয়েছে যে তিনি আগামী সপ্তাহে মস্কো আসবেন।'

শান্তিচুক্তি কি তাহলে কাছাকাছি—এমন প্রশ্নে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভকে উদ্ধৃত করে রুশ বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স জানায়, 'অপেক্ষা করুন। এখনো এ বিষয়ে বলার সময় আসেনি।'

CamScanner

প্রথম আলো

উচ্চ খেলাপি ঋণের চাপে অর্থনীতি

পিআরআইয়ের সেমিনারে বক্তারা

দেশের অর্থনীতি উচ্চ খেলাপি ঋণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও নিম্ন বিনিয়োগের দুষ্টচক্রে আবর্তিত হচ্ছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদেরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ব্যাংকিং খাতের দেওয়া মোট ঋণের প্রায় ৩৫ শতাংশ খেলাপি হয়ে যাওয়ায় দেশের অর্থনীতি কঠিন চাপে পড়েছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। এ সময়ে সঠিক এবং কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে তা অর্থনীতিতে মধ্যমেয়াদি ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, এমন আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন তাঁরা।

অর্থনীতিবিদেরা বলেন, দেশের অর্থনীতি উচ্চ খেলাপি ঋণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও নিম্ন বিনিয়োগের দুষ্টচক্রে আবর্তিত হচ্ছে। চ্যালেঞ্জিং হলেও এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) আয়োজিত এক সেমিনারে অর্থনীতিবিদেরা এসব অভিমত ও পরামর্শ দেন। গতকাল বৃহস্পতিবার পিআরআইয়ের রাজধানীর বনানীর কার্যালয়ে আয়োজিত এ সেমিনারে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। পিআরআইয়ের চেয়ারম্যান জাইদী সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রির (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিআরআইয়ের প্রধান অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান। এতে তিনি বলেন, উচ্চ খেলাপি ঋণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও নিম্ন বিনিয়োগের কারণে প্রবৃদ্ধির গতি কমে গেছে। এ অবস্থায় কঠিন পদক্ষেপ না নিলে উচ্চ খেলাপি ঋণের কারণে দেশের অর্থনীতিতে মধ্যমেয়াদি ঝুঁকি তৈরি হবে। এতে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনা সংকুচিত হতে পারে। কীভাবে এই খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা করা হবে, সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁর মতে, দেশের অর্থনীতি এখন আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছে।

> **আমরা চিৎকার করলেও সরকার শুনছে না। সরকার জ্বালানির দাম বাড়িয়েও সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছে না। ২০২২ সালের পর থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে।**
>
> আনোয়ার উল আলম চৌধুরী, সভাপতি, বিসিআই

নীতি সুদহারের কারণে মূল্যস্ফীতি ৩৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে এসেছে জানিয়ে আশিকুর রহমান বলেন, এটা ধীরে নামলেও মুদ্রানীতি কাজ করছে। উচ্চ খেলাপি ঋণের মধ্যে সুদহার কমতে পারে না বলে মনে করেন তিনি। বলেন, নির্বাচন হলেই সব সমাধা হয়ে যাবে না।

পিআরআইয়ের চেয়ারম্যান জাইদী সাত্তার বলেন, অর্থনীতির গতি কমলেও স্থিতিশীলতা এসেছে। আশিকুর রহমানের মতো জাইদী সাত্তারও বলেন, দেশের অর্থনীতি উচ্চ খেলাপি ঋণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও নিম্ন বিনিয়োগের দুষ্টচক্রে আবর্তিত হচ্ছে। তবে চ্যালেঞ্জিং হলেও এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কর্মসংস্থান বাড়াতে আরও উদার নীতি গ্রহণ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের প্রভাবে রপ্তানি কিছুটা কমলেও বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে এখনো ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে বলে মনে করেন তিনি।

খেলাপি ঋণ বাড়তে থাকায় ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন হচ্ছেন উল্লেখ করে বিসিআইয়ের সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, ১৭ শতাংশ খেলাপি ঋণ থাকার সময় আইএমএফ বাংলাদেশকে মধ্যম মানের ঝুঁকিপূর্ণ বলেছিল। এখন তা ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর প্রশ্ন, আইএমএফ এখন বাংলাদেশের খেলাপি ঋণকে কোন মানের আখ্যা দেবে? ঋণের ব্যয় আরও বাড়বে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

দেশের অর্থনীতিতে রক্তক্ষরণ হচ্ছে বলেও মন্তব্য করে আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, 'আমরা চিৎকার করলেও সরকার শুনছে না। তারা ব্যবসায়ী মহলকে গ্রাহ্য (কেয়ার) করছে না। সরকার জ্বালানির দাম বাড়িয়েও সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছে না। ২০২২ সালের পর থেকেই জ্বালানি সংকটে উৎপাদন কমেছে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তারা সবাই ঢাকায় এসে "টেসলা" (অটোরিকশা) চালাচ্ছে। এই শহরের জনসংখ্যা এখন সাড়ে তিন কোটি হয়ে গেছে। তাদের খবর কেউ রাখছে না।'

রাজস্ব বিভাগের অবস্থা আগের চেয়ে আরও খারাপ হয়েছে মন্তব্য করে আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, কী সংস্কার হলো? জিডিপির অনুপাতে কর আদায়ের হার কমে ৬ দশমিক ৬ শতাংশে নেমেছে।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে পাদুকা প্রতিষ্ঠান পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) অমৃতা মাকিন ইসলাম বলেন, 'পোশাক খাত এখন রোবোটিক এবং যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। তাই কর্মসংস্থানের জন্য নতুন খাতে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের প্রচুর সংযোগ শিল্প প্রয়োজন। বিগত সময়ে আমরা কর্মসংস্থানবিহীন প্রবৃদ্ধি দেখেছি। তাই সামনে কর্মসংস্থান তৈরি করা চ্যালেঞ্জ হবে।'

CamScanner

প্রথম আলো

ট্রাম্প আসলে ইউরোপের পিঠে ছুরি মেরেছেন

হ্যারল্ড জেমস

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ একটি ভয়াবহ ঘটনা। এর অবসান জরুরি। কিন্তু কীভাবে? যুদ্ধ এখন যেহেতু প্রায় অচলাবস্থায়, তাই এর রাজনৈতিক সমাধান খোঁজা স্বাভাবিক। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন যে শান্তি পরিকল্পনা এসেছে (যার ভাষাবিন্যাস পুরোপুরি রুশ ক্রেমলিনের লেখা বলেই মনে হয়), তা দেখলে বোঝা যায়, এই রাজনৈতিক খেলায় পুরো সুবিধাটাই আক্রমণকারী পক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের প্রাথমিক কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ ২৮ দফা পরিকল্পনা চারটি আলাদা ঘটনার পরে আসে, যেগুলো প্রতিটিই একেকটি মোড় ঘোরানোর মতো অবস্থা তৈরি করেছিল।

প্রথমত, ইউক্রেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির নেতৃত্বকে দুর্বল দেখানোর জন্য এবং ইউক্রেনের সরকার পরিবর্তনের দাবি তোলার জন্য ইউক্রেনের নিজস্ব দুর্নীতি দমন সংস্থাগুলো থেকে আসা এসব অভিযোগকে ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়া পশ্চিমা দেশগুলোকে লক্ষ্য করে আরও তীব্র ও অযৌক্তিক পারমাণবিক হামলার হুমকি দিচ্ছে। তারা এমন অস্ত্র পরীক্ষা করেছে বলে দাবি করছে, যা নাকি যুক্তরাজ্যসহ উত্তর ইউরোপের সমুদ্রতীরবর্তী নিচু এলাকার ওপর তেজস্ক্রিয় 'সুনামি' তৈরি করতে পারে। ক্রেমলিন বলছে, তাদের 'বুরেভেস্তনিক' নামের পারমাণুচালিত ক্রুজ মিসাইল কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দিয়ে থামানো যাবে না। এসব হুমকির উদ্দেশ্য ইউরোপকে ভয় দেখানো, যাতে তারা ইউক্রেনকে আর সামরিক সহায়তা না দেয়।

তৃতীয়ত, ইউরোপের নানা দেশে 'অ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্ট' বা প্রথাবিরোধী জনতাবাদী দলগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিসরের বিভিন্ন পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করাকে তাদের প্রধান দাবি বানিয়েছে।

এদিকে ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের সরকারগুলোকে দুর্বল, অকার্যকর ও দিশাহারা দেখাচ্ছে। তারা বুঝে উঠতে পারছে না কীভাবে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করবে, প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া কাটিয়ে উঠবে, কিংবা নিজেদের ভাঙা সমাজগুলোকে আবার একত্র করবে। ফলে বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইউরোপে এমন এক নতুন রাজনীতির যুগ শুরু হচ্ছে, যেখানে মারিঁ লো পেনের ন্যাশনাল র‍্যালি ফ্রান্সে, অলটারনেটিভ ফিউর ডয়চল্যান্ড জার্মানিতে আর নাইজেল ফারাজের রিফর্ম ইউকে ব্রিটেনে ক্ষমতায় যেতে পারে।

শেষত, ট্রাম্প প্রশাসন ইউরোপ ও ইউরোপীয় রাজনীতি নিয়ে নানা ধরনের ভুল তথ্য (ডিজইনফরমেশন) ছড়াচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন নাকি রাশিয়ার তেল কিনে নিষেধাজ্ঞা ভাঙছে। বাস্তবে, রুশ তেল কেনা এখন সীমাবদ্ধ মাত্র দুটি দেশে। এর একটি হলো হাঙ্গেরি; অপরটি স্লোভাকিয়া। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে হাঙ্গেরি। তাদের প্রকাশ্য ক্রেমলিনপন্থী সরকার ট্রাম্পের কাছে রাশিয়ার জ্বালানি কেনা অব্যাহত রাখার অনুমতি চেয়েছিল। আর ট্রাম্প তাদের সে অনুমতি দিতে কোনো আপত্তিই করেননি।

সর্বশেষ মার্কিন শান্তি প্রস্তাবের কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিভ্রান্তিকর বর্ণনা। এটি কিছু পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিশ্লেষক বহুদিন ধরে তুলে ধরছেন। তাঁদের দাবি হলো, ন্যাটো নাকি রাশিয়ার জন্য হুমকি, আর রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোকে দেওয়া পশ্চিমা নিরাপত্তা-গ্যারান্টি নাকি রাশিয়ার সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ। তাঁদের মতে, ১৯৯০-এর দশকে ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণই সেই বিস্ফোরক, যা ২১ শতকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে উড়িয়ে দেয় এবং রাশিয়াকে ২০১৪ সালে 'প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে' নামায় এবং ২০২২ সালে সে যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হয়।

যাঁরা মনে করেন ন্যাটোর বিস্তারই ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের কারণ, তারা মূলত ক্রেমলিনের কথাই বিশ্বাস

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা মূলত পুতিনের হাতকেই শক্তিশালী করছে। ছবি : রয়টার্স

করছেন। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করেন, ন্যাটো রাশিয়ার জন্য আসল হুমকি। কিন্তু তারা আসল হুমকিটিকে, অর্থাৎ সফল গণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনকে উপেক্ষা করছেন।

ক্রেমলিন এখনো উনিশ শতকের তিনটি নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে: অর্থোডক্স খ্রিষ্টিয়ানিটি, স্বৈরতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ। এই মানদণ্ডে রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানে অন্য দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণ দমন করার অধিকার।

এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন আসে—সংঘাত কি 'স্থির' অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব? কার্যকর যুদ্ধবিরতি হলে মানুষকে পুনর্বাসন করা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করা যেত। কিন্তু এই যুদ্ধবিরতি যদি রাশিয়ার চাপানো রাজনৈতিক সমাধান থেকে আসে, তাহলে ইউক্রেন, ইউরোপ এবং পুরো বিশ্বের জন্য এর পরিণতি হবে ভয়াবহ।

সংশোধিত ট্রাম্প পরিকল্পনায়ও গুরুতর সমস্যা আছে। সেখানে স্পষ্ট ও শক্তিশালী ন্যাটো-ধরনের নিরাপত্তা গ্যারান্টি নেই। রাশিয়া আবার আক্রমণ করলে ঠিক কী করা হবে, তার বদলে শুধু বলা আছে—'আলোচনা হবে'। এই অস্পষ্টতা পুরো পরিকল্পনাটিকে খুবই বিপজ্জনক করে তোলে।

ইউক্রেনের দৃষ্টিতে, ট্রাম্পের পরিকল্পনা ছিল একধরনের 'পেছন থেকে ছুরি মারা'। ইউক্রেনের সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত না হলেও এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে দেশটি যুদ্ধেই হার মানবে। তখন ইউক্রেনের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করবে—এর দায় কার? এতে দেশের ঐকমত্যনির্ভর রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এবং দেশ আবার স্বৈরশাসনের দিকে হোঁচট খেতে পারে।

ট্রাম্পের মূল পরিকল্পনা ইউরোপ, ইউরোপের প্রতিষ্ঠান এবং তার বিশ্বদৃষ্টিকেও দুর্বল করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নকে তখন কাগুজে বাঘ হিসেবে দেখা হবে। সবাই মনে করবে, তার বড় বড় কথা ও বড় বড় ধারণা আছে, কিন্তু বাস্তবে তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা নেই। এমন ধারণা ছড়িয়ে পড়লে ইউরোপীয় রাজনীতিবিদেরা বেশি করে নতিস্বীকার করবে ডানপন্থী (এবং কিছু ক্ষেত্রে বামপন্থী) সেই শক্তিগুলোর কাছে, যারা অতীতের জাতীয় সার্বভৌমত্বকেই ফিরিয়ে আনতে চায়।

বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় প্রকল্পকে এগিয়ে নেওয়া দুই শক্তিশালী দেশ জার্মানি ও ফ্রান্সের জন্য এমন পরিবর্তন অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে। বাকি বিশ্বের জন্যও মার্কিন অবস্থান ভয়াবহ ইঙ্গিত বহন করে। রাশিয়ার ইতিহাস বর্ণনাকে এমন সরলভাবে গ্রহণ করা জানিয়ে দেয়—বিশ্বে আমেরিকার ক্ষমতা ও প্রভাব এখন চূড়ান্ত পতনের দিকে। এর মধ্য দিয়ে যে বার্তা পাওয়া যায়, তা খুবই স্পষ্ট: এখন আমেরিকা কিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে না, তাই তাকে সহজেই কিনে ফেলা যায়।

● **হ্যারল্ড জেমস** প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের অধ্যাপক

স্বত্ব: **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, অনুবাদ: **সারফুদ্দিন আহমেদ**

CamScanner

প্রথম আলো

ধর্ম

ভূমিকম্প নিয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ ও ব্যবহারিক বিধান

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

প্রকৃতিতে আল্লাহর কুদরতি শক্তির অন্যতম নিদর্শন হলো ভূমিকম্প। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে—এর কী হলো? সেদিন পৃথিবী তার বিবরণ প্রকাশ করবে, কারণ তোমার প্রতিপালক (আল্লাহ) তাকে তা করার নির্দেশ দেবেন। সেদিন মানুষ বিচ্ছিন্ন দলে বেরিয়ে আসবে, যাতে তাদের কৃতকর্ম তাদের সামনে প্রদর্শন করা যায়। যে কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখবে; আর যে কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সে তা-ও দেখবে।' (সুরা-৯৯ জিলজাল, আয়াত: ১-৮)।

মহানবী (সা.) বলেন, 'যখন অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জিত হবে, আমানত বিশ্বাস করে গচ্ছিত রাখলে তা আত্মসাৎ করা হবে, জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া বিদ্যা অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর অনুগত হয়ে মায়ের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করবে, বন্ধুকে কাছে টেনে নিয়ে বাবাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদে শোরগোল হবে এবং অযোগ্য ব্যক্তি সমাজের নেতা হবে—তখন তোমরা অপেক্ষা করো লাল আভাযুক্ত ঝড়, ভূকম্পন, ভূমিধস, লিঙ্গ পরিবর্তন, পাথরবৃষ্টি এবং সুতা ছেঁড়া তসবিহর দানার মতো একটির পর একটি নিদর্শনের।' (তিরমিজি)

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা কি নির্ভয় হয়ে আছ সেই সত্তার (আল্লাহর) কাছ থেকে, যিনি আকাশে রয়েছেন—যে তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন না? যখন তা হঠাৎ কাঁপতে থাকবে! অথবা তোমরা কি নির্ভয় হয়ে আছ, যে আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল!' (সুরা-৬৭ মুলক, আয়াত: ১৬-১৭)।

'তুমি পর্বতমালা দেখছ, মনে করছ সেগুলো স্থির, অথচ সেগুলো মেঘপুঞ্জের মতো সঞ্চারমান। এটি আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা যা করো, তিনি সে সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত। যে কেউ সৎ কর্ম নিয়ে আসবে, সে তার চেয়েও উত্তম প্রতিফল পাবে এবং সেদিন তারা ভয়-আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকবে।' (সুরা-২৭ নমল, আয়াত: ৮৮-৮৯)

প্রকৃতি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। আমরা প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে পারি না; বরং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের মতো ব্যবস্থা করতে পারি। আল্লাহর নির্দেশে মানুষ তীব্র ঠান্ডা ও চরম গরম থেকে বাঁচার জন্য, প্রকৃতিকে জয় করে

> সময়োপযোগী, ভূমিকম্প-সহনশীল ও নিরাপদ আবাসনের জন্য ভবন নির্মাণে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নীতিমালা মেনে বাড়িঘর নির্মাণ করা উক্ত আয়াতের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত

জীবনধারণের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি ও নানা উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছে। আত্মরক্ষা ও মানবসভ্যতার সুরক্ষার জন্য যা যা করণীয়—তা করার নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআনে; আর অবহেলা ও উদাসীনতার মাধ্যমে নিজেদের ক্ষতির মধ্যে ফেলার নিষেধও রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নিজেদের স্বহস্তে ধ্বংসে নিপতিত কোরো না।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৯৫)।

সময়োপযোগী, ভূমিকম্প-সহনশীল ও নিরাপদ আবাসনের জন্য ভবন নির্মাণে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নীতিমালা মেনে বাড়িঘর নির্মাণ করা উক্ত আয়াতের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন মাজিদে রয়েছে:

'মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ তাদের আস্বাদন করান, যাতে তারা সুপথে ফিরে আসে।' (সুরা-৩০ রুম, আয়াত: ৪১)

নবীজি (সা.) বলেন, 'যখন কোথাও ভূমিকম্প হয়, সূর্যগ্রহণ ঘটে, ঝোড়ো বাতাস বা বন্যা দেখা দেয়—তখন মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কাছে অতি দ্রুত তওবা করা, তাঁর কাছে নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা, তাঁকে অধিক হারে স্মরণ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা।' আর তিনি আরও বলেন, 'তোমরা দ্রুততার সঙ্গে মহান আল্লাহকে স্মরণ করো এবং তাঁর কাছে তওবা করো।' (বুখারি: ২/৩০; মুসলিম: ২/৬২৮)

তওবার অন্যতম শর্ত হলো কৃত ভুল সংশোধন করা। সুতরাং আবাসনব্যবস্থায় ও ভবন নির্মাণে কোনো ত্রুটি থাকলে তা যথাযথ সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত ও নিরাপদ করা—এটিও তওবা কবুলের পূর্বশর্তের অংশ।

মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী
যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম
smusmangonee@gmail.com

CamScanner

অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরছে, দরকার কাঠামোগত সংস্কার

■ সমকাল প্রতিবেদক

পিআরআইর সেমিনারে বক্তারা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্বল্পমেয়াদে স্থিতিশীলতা ফেরার ইঙ্গিত মিললেও সামগ্রিক পুনরুদ্ধার ধারা এখনও ফেরেনি। এমন সতর্ক বার্তা দিয়েছে গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)। দেশে খেলাপি ঋণ বেড়ে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সংস্থাটি বলছে, এই অঙ্ক বেড়ে ৯ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হতে পারে। এ পরিস্থিতি সামাল দিতে ভুল করলে উচ্চ সুদহারের কারণে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান কমবে। ফলে দেশ উচ্চ সুদ– উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি– নিম্ন বিনিয়োগ– নিম্ন প্রবৃদ্ধির ফাঁদে আটকে যেতে পারে। এ পরিস্থিতি এড়াতে প্রয়োজন কাঠামোগত সংস্কার।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর বনানীতে পিআরআই কার্যালয়ে মাসিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা অনুষ্ঠান ও সেমিনারে উপস্থাপিত প্রতিবেদন এবং বক্তাদের বক্তব্যে এমন পর্যবেক্ষণ ও শঙ্কার কথা উঠে এসেছে। সেমিনারের যৌথ আয়োজক ছিল পিআরআইর সেন্টার ফর ম্যাক্রো ইকোনমিক অ্যানালাইসিস (সিএমইএ) ও অস্ট্রেলিয়া সরকারের ডিফ্যাট। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ। সভাপতিত্ব করেন পিআরআইর চেয়ারম্যান ড. জাইদী সাত্তার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থার প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. আশিকুর রহমান।

পিআরআইর মাসিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহে উন্নতি এবং মূল্যস্ফীতি কমার ফলে অর্থনীতিতে সাময়িক স্বস্তি ফিরেছে। তবে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে অনীহা, ঋণ প্রবৃদ্ধির ধীরগতি এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ব্যবসায়িক আস্থাকে দুর্বল করে রেখেছে।

২৫ বছরের মধ্যে খেলাপি ঋণের হার সর্বোচ্চ হওয়া অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করে শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা, কার্যকর ঋণ পুনর্গঠন কাঠামো ও দ্রুত সংস্কারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, 'দেশের অর্থনীতিতে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সরকার জ্বালানির দাম বাড়িয়েও সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছে না। ২০২২ সালের পর জ্বালানি সংকটে উৎপাদন কমেছে, প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। আমরা (ব্যবসায়ী) চিৎকার করলেও সরকার শুনছে না।'

এই ব্যবসায়ী নেতা আরও বলেন, শক্তিশালী নীতি কাঠামো, দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি কৌশল, দক্ষতা উন্নয়ন, কার্যকর এনবিআর এবং ব্যাংকিং খাত সংস্কার ছাড়া অর্থনীতি স্থিতিশীল হবে না।

ড. জাইদী সাত্তার বলেন, মে থেকে বাড়তে থাকা রিয়েল ইফেকটিভ এক্সচেঞ্জ রেট রপ্তানিনির্ভর খাতের জন্য উদ্বেগজনক। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন আর ডলার কিনে টাকার মান কমাতে পারছে না। তাই আমদানি শিথিল করাই বাস্তবসম্মত পথ।

মূল প্রবন্ধে ড. আশিকুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা কখনও এত বড় সংকটে পড়েনি। ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ এখন ৬ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা মোট ঋণের প্রায় ৩৬ শতাংশ। তবে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ আরও বেশি।

প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ বলেন, করনীতি আমলা নয়, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের নির্ধারণ করা উচিত।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. একেএম আতিউর রহমান বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান না হলে খেলাপি ঋণের প্রকৃত আকার কখনও জানা যেত না।

CamScanner

ভেনেজুয়েলায় সিআইএ যা করতে চাইছে

বেলেন ফার্নান্দেজ

আন্তর্জাতিক

শনিবার সংবাদ সংস্থা রয়টার্স একটি এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে দাবি করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র 'সামনের দিনগুলোতে ভেনেজুয়েলা সম্পর্কিত অভিযানের একটি নতুন পর্যায় শুরু করতে যাচ্ছে।' প্রতিবেদনে চার মার্কিন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, যারা নাম গোপন রাখার শর্তে কথা বলেছেন। দুই কর্মকর্তা বলেছেন, গোপন অভিযান সম্ভবত ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে এই 'নতুন পদক্ষেপ'-এর প্রথম ধাপ হবে।

এটি মোটেও অবাক করার মতো খবর নয়। কারণ এক মাসেরও বেশি সময় আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ভেনেজুয়েলায় গোপন অভিযান পরিচালনার জন্য সিআইএকে অনুমতি দিয়েছেন। এটা এক ধরনের ব্যতিক্রমী ঘোষণা। কারণ সাধারণত গোপন অভিযান সরাসরি এভাবে প্রকাশ করা হয় না।

এটা গোপন বিষয় নয় যে, যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে বিশাল সামরিক শক্তি বৃদ্ধির তত্ত্বাবধান করছে, যেখানে বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার মার্কিন সেনা 'মাদক সন্ত্রাসবাদ'-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আড়ালে মোতায়েন রয়েছে। সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে ট্রাম্প ক্যারিবিয়ান সাগরে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডেরও নেতৃত্ব দিয়েছেন। মাদক পাচারকারী নৌকাগুলোতে বারবার বোমা হামলার নির্দেশ দিয়েছেন বলে তিনি দাবি করেছেন।

তবে আন্তর্জাতিক ও মার্কিন আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি এই হামলা স্থানীয় জেলেদের আতঙ্কিত করার বাইরে আর কিছুই করতে পারেনি।

নিশ্চিতভাবে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই তার অপছন্দের কোনো 'মাদকবিরোধী যুদ্ধ' করেনি। কারণ পুরো মাদক যুদ্ধের আখ্যানের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ জড়িত; সেই সঙ্গে আছে পশ্চিম গোলার্ধে সামরিকীকরণ; দরিদ্র আমেরিকানদের অপরাধী সাব্যস্ত এবং অন্যান্য হীন কাজ। এ কথায় কেউ কিছু নিশ্চয়ই মনে করবে না,

> 'মাদক সন্ত্রাসী' হিসেবে অপমান করা এবং এর মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের জন্য প্রচারণা চালিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর একজন পোষা প্রাণীরও লক্ষ্যবস্তু, যাকে ভেনেজুয়েলায় ওয়াশিংটনের যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রধান স্থপতি হিসেবে দেখা হয়।

মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক মাদক বাণিজ্য থেকে মুনাফা অর্জন করেছে অথবা 'সিআইএর সঙ্গে ড্রাগের সংযোগ পুরোনো'– দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ওয়েবসাইটের একটি নিবন্ধে যা বলা হয়েছে।

এখন নিশ্চয় কারও বুঝতে বাকি নেই– কেন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখার জন্য প্রচারণা চালিয়েছিলেন; তারপর তাৎক্ষণিক ইরানে বোমা হামলা চালিয়েছিলেন। তিনি এখন দেশটিকে আরও একটি সংঘাতে জর্জরিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আগ্রাসনের জন্য দেওয়া যুক্তিরও কোনো ভিত্তি নেই।

যেমন ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানাইল মাদক সংকটের দায় মাদুরোর ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে একটি ছোট সমস্যা আছে; তা হলো ভেনেজুয়েলা এমনকি প্রশ্নবিদ্ধ সিনথেটিক ওপিওয়েডও উৎপাদন করে না। এনবিসি নিউজসহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যম উল্লেখ করেছে, ভেনেজুয়েলার মাদকগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানাইল নয়, বরং ইউরোপে কোকেন রপ্তানিতে মনোনিবেশ করছে।

এটি সত্ত্বেও ১৩ নভেম্বর মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ তথা মার্কিন যুদ্ধ সচিব তাঁর শ্রোতাদের আশ্বস্ত করার জন্য এক্সের দ্বারস্থ হন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ভেনেজুয়েলার উপকূলে বিশাল মার্কিন সামরিক অবস্থান একটি মিশন, যা 'আমাদের স্বদেশকে রক্ষা করবে; আমাদের গোলার্ধ থেকে মাদক সন্ত্রাসীদের অপসারণ করে আমাদের স্বদেশকে সুরক্ষিত করবে, যা আমাদের জনগণকে হত্যা করছে।' অবশ্য এটি সেই একই প্রশাসন, যা প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা বন্ধ করে দরিদ্র আমেরিকানদের অনাহারে মারার হুমকি দিচ্ছিল। এই প্রবণতা ইঙ্গিত দেয়, 'আমাদের জনগণের' মঙ্গল আসলেই সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ নয়। আরও বিবেচনা করুন, ট্রাম্প এমন একটি দেশে বন্দুক সহিংসতা প্রতিরোধ কর্মসূচির জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল কমিয়ে দিয়েছেন, যেখানে গণহারে গোলাগুলি জীবনযাপনের অংশ হয়ে উঠেছে। স্পষ্টতই, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণহত্যা এমনভাবে 'আমাদের জনগণকে হত্যা' করছে, যার ভেনেজুয়েলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সবকিছুর জন্য মাদুরোকে দোষ দেওয়া অনেক বেশি মজার, তাই না?

পূর্বসূরি হুগো শ্যাভেজের মতো মাদুরো দীর্ঘদিন মার্কিন সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে কাঁটা হয়ে আছেন। তাই তাঁকে 'মাদক সন্ত্রাসী' হিসেবে অপমান এবং এর মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের জন্য প্রচারণা চালিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর একজন পোষা প্রাণীরও লক্ষ্যবস্তু, যাকে ভেনেজুয়েলায় ওয়াশিংটনের যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রধান স্থপতি হিসেবে দেখা হয়।

এদিকে শনিবার ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, 'হোয়াইট হাউস মাদুরোকে চাপ দেওয়ার জন্য দু-একটি মনস্তাত্ত্বিক অভিযানের অংশ হিসেবে মার্কিন সামরিক বিমান থেকে ভেনেজুয়েলার কারাকাসে লিফলেট ফেলার একটি ধারণা প্রস্তাব করেছে।'

মনে হচ্ছে, এগুলো পুরোনো ইসরায়েলি খেলা-সংক্রান্ত সামরিক দলিলেরই একটা পাতা অথবা লিফলেট। আর ট্রাম্প প্রশাসন যখন ভেনেজুয়েলার জন্য তার গোপন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন এ ধরনের বেপরোয়া আচরণ মার্কিনিদের স্বদেশ বা অন্য কারও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে না।

■ বেলেন ফার্নান্দেজ: আলজাজিরার কলামিস্ট;
আলজাজিরা থেকে ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম

CamScanner

BEYOND READYMADE GARMENTS INDUSTRY

Next frontier of Bangladesh's export diversification

The era of single-engine growth is coming to an end. The global economy is undergoing transition, and so must Bangladesh. It is a moment in history for the country where its demography, technology, entrepreneurship, and cooperation in the region are aligning in favor of our growth trajectory

writes

Serajul I Bhuiyan

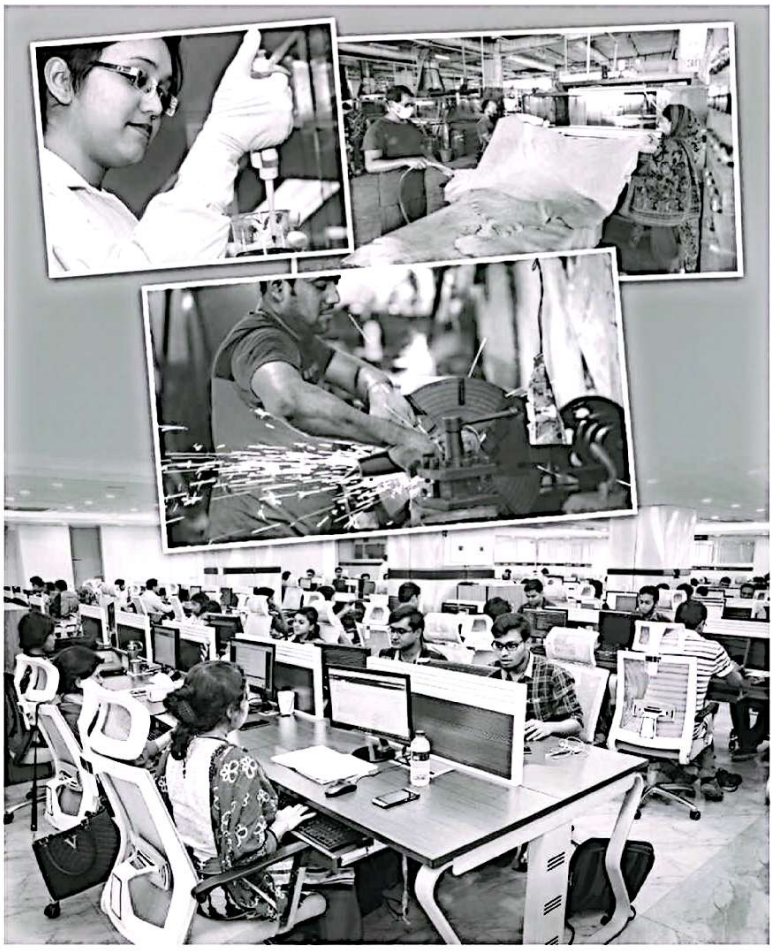

There are always points in the economic development of countries where the roadmap for the future becomes distinctly visible once the driving engine, which for so long propelled success to dizzying heights, is no longer commensurate with ambitions born out of success. Bangladesh has finally reached that juncture in its economic development. For over four decades, its success story has remained its readymade garments (RMG) industry, which has emerged as a success saga for so long that it has made Bangladesh into the second-largest supplier to the global fashion stores. However, no country that has ambitions to reach trillion dollars can bank on its second-largest contributor to its export revenue to contribute above 80 per cent to its revenue streams.

A NATION AT AN EXPORT CROSSROADS: The success in Bangladesh's exports has long had its roots in its RMG industry. Units multiplied exponentially, global buyers poured in, and for countless numbers of countrywomen, doors to empowerment swung wide in welcome. However, it has also created a new kind of vulnerability for Bangladesh vulnerability to overdependence on its RMG industry. The problem with any industry that contributes so greatly to country exports is that any adverse shock whether global recession, supply-chain disruptions, or geopolitical tensions can impact the entire country.

Economists are warning that Bangladesh has now reached the point where single-sector approach growth is no longer possible. The future of the garments industry is undergoing tremendous change due to automation, nearshoring, government regulations on climate change, and sharp competition from other countries such as Vietnam, Turkey, and Ethiopia. It is no longer possible for Bangladesh to fashion its way to middle-class global status.

The opportunity exists. Today, Bangladesh has youth, technology, entrepreneurship, and geographic linkages between South Asia, Southeast Asia, and the Bay of Bengal on its side. Now, the challenge lies in ensuring that these factors are leveraged for Diversified Export on behalf of Bangladesh.

PHARMACEUTICAL SECTOR – THE BEHIND-THE-SCENES GIANT: This industry has remained largely overshadowed by the dominance of garments in public rhetoric but is perhaps second to none in terms of its promise for Bangladesh as a high-value industry since their independence. Currently, local pharmaceutical companies are meeting the entire country's demand, in addition to supplying more than 150 countries in Asia, Africa, and Latin America.

This experience in making generics, taking advantage of the World Trade Organization (WTO) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) exemption for Least Developed Countries (LDCs), has provided Bangladesh with a fantastic foundation. With Bangladesh poised to graduate and move out of its LDC status, pharmaceuticals' ability to develop advanced formulation, biologics, vaccine development research, or API manufacturing will provide assistance in upgrading pharmaceuticals to a multi-billion-dollar industry via its global markets.

As observed by industry analysts, with rising demand for cheaper drugs in the global arena, especially within the developing countries, Bangladesh has emerging opportunities for its competitive advantage, which is its ability to provide quality generic drugs at cheaper rates. However, to effectively exploit this opportunity, modifications in regulatory matters and emphasis on global acceptance for quality certification are essential.

The export councils are also of the view that "if a holistic approach can be adopted whereby tax incentives for API production, streamlined approval schedules for drugs, and brand-building campaigns for 'Made in Bangladesh Pharma' are provided, then this industry can emerge as one of its biggest earners of foreign exchange by 2035. This is a new frontier that Bangladesh cannot miss."

LEATHER & LIGHT ENGINEERING -- EXTENDING MANUFACTURING OUTSIDE THE CONVENTION: The leathers industry remains one of the most underrated sectors for exports for Bangladesh. For many years, it has struggled with issues of compliance, environment, and delays in relocation. However, the opportunity in this sector is enormous. One thing that international buyers always mention is that products such as leathers and footwear from Bangladesh are on par with international standards, but environmental certification creates hurdles for entry into higher markets. Effective and full implementation of the Savar Tannery Industrial Estate could change the face of the industry overnight. With efficient treatment facilities for effluent, common certification, and environmental observance, it will not be difficult for the Bangladesh leather goods industry to rake in additional revenue to the tune of US$5 to $7 billion every year. It is important to ensure that they are confident about the entire observance structure.

Light engineering is also a bright spot. This industry does not get the attention that it deserves, but it has great prospects to emerge as the backbone of a diversified manufacturing economy. The Bangladeshi companies are already making parts for bicycles, automobiles, agricultural machinery, and home appliances. With proper policy assistance in terms of lower import duties on basic materials, special zones for precision engineering, and technical education in precision machining, this country can emerge as a Tier-2 supplier to global companies.

Vietnam, Thailand, and Malaysia exploit this approach to the fullest. Bangladesh has every opportunity to pursue this approach too by creating avenues for SMEs to innovate, grow, and gain access to international buyers.

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES -- THE DIGITAL FRONTIER THAT AWAITS TAKEOFF: One of the most underutilised national resources for Bangladesh is its ICT talent. With over 650,000 freelance ICT professionals, coupled with thousands of new ICT graduates annually, Bangladesh has emerged as one of the top providers of online talents in the global marketplace. This is only a fraction of its full potential. Information technology services relating to software development, security, cloud services, AI services, and BPO services have emerged as new areas for global exports. Nations such as Vietnam and the Philippines are banking on their youth to generate billions in revenue in terms of information technology exports. Bangladesh has this opportunity too, but for that, right investments are required.

Three are always emphasised. First, the country needs to develop its national approach to skills acceleration to teach children the skills that are most needed by the global environment, including cloud technology, AI, mobile development, and data analytics.

Second, Bangladesh must develop top-class global technology infrastructure to include always-on broadband and qualified data centers that give global clients assurance and confidence in terms of security and reliability.

Third, Bangladesh must develop its global brand to enable it to emerge as a secure outsourcing location, which entails both publicity and improvement in standards.If this happens, IT services can emerge as one of the country's biggest earners of foreign exchange within a decade, making not only its economy but also its workforce diverse.

AGRO-PROCESSING -- WHERE RURAL PROSPERITY AND WORLD DEMAND MEET: Agricultural products are key to Bangladesh, but its agricultural export growth has remained well below its actual potential. Agro-processing acts as a 'connecting link' between local farmers and global supply chains. Various products including shrimp, ice-cubed fish, processed fruits, spices, juice, 'ready to eat' products, and 'halal products' also find substantial markets abroad.

However, inconsistencies in supply chains restrict its ability to participate effectively in niche markets. Cold storage facilities are insufficient, certification for food safety is distributed over various government agencies, and its inability to provide integrated logistics increases its reliance on costly exports. This makes Bangladesh sell their products raw or processed to only tap into a very limited portion of international value addition. Agricultural economists recommend that for Bangladesh, it is essential to develop countrywide cold chains between farmers, processors, and exporters. This will itself decrease post-harvest losses to a substantial extent and enhance overall exports. Moreover, contract farming arrangements where input supplies and training are also provided to farmers can ensure quality. The demand for halal, organic, and sustainably produced food products is escalating exponentially. Bangladesh, with its original fit in this domain, ought to be at the forefront in the global halal food market. It has tremendous potential to emerge as a multi-billion-dollar industry for agro-processing, concurrently lifting up agricultural livelihoods and countrywide food industries.

THE POLICY IMPERATIVE: No industry can grow in an environment where policies are not favorable. Economists repeatedly stress that Bangladesh needs to introduce a new type of incentive structure one that favors added-value, R&D, and adherence rather than added numbers.

The incentives for cash support need to focus on research, development skills, green manufacturing, and sophistication in exports. An enterprise into biologics (a broad category of medicines derived from living organisms that are used to treat a variety of diseases, including cancer, autoimmune disorders, and diabetes) or AI or engaged with global environmental standards in its leather manufacturing practices needs to be treated separately in terms of incentives rather than on par with other traders in low-value goods.

Infrastructural deficiencies are also important areas where Bangladesh needs to fill its gaps. The World Bank estimates that Bangladesh is losing between 7-8 per cent of its probable export value in terms of delays in ports, customs, and expensive logistics. It has become essential to opt for modernization. Automated customs and inland container depots, roads, and port management technology are essential areas where Bangladesh needs to focus on making these priorities for the country.

Finally, it is essential for Bangladesh to integrate into regional trade thoroughly. The BBIN Initiative, BIMSTEC, and BCIM corridors are massive opportunities for reducing costs and getting new markets. In addition to this, countries like South Korea, Singapore, and Indonesia are also interested in investments in sectors including energy and agriculture.

Picture this: Bangladeshi drugs are quickly distributed to Nepal, agro-processed products are delivered to India within hours, not days, and IT firms are able to work in perfect synergy with Bhutan and Sri Lanka. This is no fanciful notion but rather the reality that will soon greet our wake-up calls.

THE NEXT DECADE WILL DEFINE BANGLADESH'S ECONOMIC DESTINY: The era of single-engine growth is coming to an end. RMG will always remain a pivot for the country's exporting economy, but it must not continue to remain its only pivot. The global economy is undergoing transition, and so must Bangladesh. It is a moment in history for the country where its demography, technology, entrepreneurship, and cooperation in the region are aligning in favor of our growth trajectory.

If Bangladesh is to take advantage of this opportunity, it needs to act with boldness, with certainty, and with relentless efforts on reform. Export diversification is not just a policy or an approach it is a and a catalyst for sustained.

As Bangladesh seizes this opportunity, it has every chance to develop its own export environment, which is broader, smarter, greener, and more innovative than anything that has ever existed in this country or anywhere else in its history. The next installment in the Bangladesh growth saga must be written not by one industry but by many that are on the rise.

The day to emerge out from RMG is not in the far-off distance.It is now.

Dr Serajul I Bhuiyan is a professor of journalism and mass communications at Savannah State University, Savannah, Georgia, USA. sibhuiyan@yahoo.com

CamScanner

নেতানিয়াহুর গ্রেফতারি পরোয়ানা : ফরাসি বিচারক লক্ষ্যবস্তু

ওয়েন জোনস

এক ফরাসি বিচারকের ভাগ্যকে পশ্চিমা বিশ্বের দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা পতনের একটি কেস স্টাডি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ঐ বিচারকের নাম নিকোলাস গিলু, যিনি অনলাইনে কেনাকাটা করতে পারেন না। একবার তিনি এক্সপিডিয়া (Expedia) ব্যবহার করে নিজের দেশের একটি হোটেল বুকিং করতে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় তার বুকিংটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাতিল হয়ে যায়। এখনো তিনি 'বিশ্বের অধিকাংশ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কালো তালিকাভুক্ত' রয়েছেন। ফলে বেশির ভাগ ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করতে বাধার সম্মুখীন হন।

বুঝতে পারছেন বিষয়টা? গিলুকে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, যার ফলে তিনি আল-কায়েদা সন্ত্রাসী, মাদক পাচারকারী চক্র এবং ভ্লাদিমির পুতিনের কাতারে ঢুকে গেছেন। অর্থাৎ, ১৫ হাজারেরও বেশি নামের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। কেন এমনটা হলো? এর কারণ, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রাক্-বিচারিক চেম্বার-১-এর আরো দুই বিচারকের সঙ্গে তিনিও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এবং হামাসের সামরিক শাখার প্রাক্তন কমান্ডার মোহাম্মদ দেইফের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা অনুমোদন করেছিলেন।

গত জুন মাসে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সময় যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে যে, গিলু এবং তার সহকর্মীরা 'আইসিসির অবৈধ ও ভিত্তিহীন পদক্ষেপে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, যা আমেরিকা বা আমাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরাইলকে লক্ষ্য করে' পরিচালিত হয়েছে। ফলে এখন তাদের সবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ। যদিও এটা তাদের জন্য যথেষ্ট শাস্তি নয়।

আইনের শাসনের প্রতি অবজ্ঞা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যুক্তির পেছনে মূল কারণটি পরিষ্কার, যা অত্যন্ত নির্মম; আর সেটি হলো, আইনের শাসন বিশ্বের প্রধান শক্তি (hegemon) কিংবা তার ঘনিষ্ঠ মিত্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম এ নিয়ে সরাসরি কথা বলেছেন। আইসিসির প্রধান প্রসিকিউটর করিম খান—যিনি নিজেও এই নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত—তাকে বলেছিলেন যে, আইসিসি কেবল 'আফ্রিকা ও পুতিনের মতো গুন্ডাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, ইসরাইলের মতো গণতন্ত্রের জন্য' নয়।

যুক্তরাষ্ট্র এই আদালতের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিল। কারণ, তারা স্পষ্টতই আশঙ্কা করেছিল যে, বিদেশের মাটিতে তাদের যুদ্ধাপরাধ করার প্রবণতা হয়তো একদিন বিচার প্রক্রিয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে। বাস্তবে হয়েছেও তাই! আইসিসি ওয়াশিংটনকে এখন চীন, রাশিয়া ও ইসরাইলের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের কাতারে ফেলে দিয়েছে। ফিলিস্তিন এক দশক আগে এ আদালতের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল, আর সে কারণেই আইসিসি এখন এই ভূখণ্ডে কিংবা দেশটির নাগরিকদের অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার রাখে।

গিলু ও তার সহকর্মীরা একটি দীর্ঘ, সতর্ক আইনি প্রক্রিয়ার পর তাদের পরোয়ানা জারি করেছিলেন। ইসরাইলি রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে মামলাটি 'অনাহারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার' করার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরিচালিত হয়েছিল, যা মিথ্যা নয়। ইসরাইলি নেতাদের কথাতেই এই দাবির সত্যতা পাওয়া যায়; যেমন—ইসরাইলের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট যখন গাজা উপত্যকায় সম্পূর্ণ অবরোধ ঘোষণা করেছিলেন, তখন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আমরা আমাদের ভূখণ্ড থেকে খাদ্য ও ওষুধ কিংবা মানবিক সহায়তা গাজা উপত্যকায় ঢুকতে দেব না।' অর্থাৎ গাজায় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ভিক্ষের অবতারণা ঘটায়। বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয় ২০২৪ সালের বসন্তে, যখন খোদ দুই দুইটি মার্কিন সরকারি সংস্থা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, ইসরাইল গাজায় ইচ্ছাকৃতভাবে মানবিক সহায়তা আটকে দিচ্ছে। এই দাবির পর মার্কিন আইন অনুযায়ী গাজায় সব ধরনের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তা না করে উলটো মার্কিন সরকার তার নিজের আইনকেই অগ্রাহ্য করতে শুরু করে।

ইসরাইলের দায়মুক্তি এবং 'কৌশলগত সম্পদ'

গাজার বিলুপ্তি, এই ভূখণ্ডের জনগণকে নির্বিচারে হত্যা, বেসামরিক অবকাঠামোকে পদ্ধতিগতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। এসবের কারণে গণহত্যা গবেষকদের মধ্যে এই ঐকমত্য তৈরি হয়েছে যে, ইসরাইল গাজায় গণহত্যা (genocide) চালিয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কাছে এটা পাত্তা পায়নি। বরং আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলাবোধের প্রতি তারা সামান্যতম সম্মান তো বজায় রাখেইনি, অধিকন্তু ইসরাইলের দায়মুক্তি বজায় রাখাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছে।

> যুক্তরাষ্ট্র এই আদালতের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিল। কারণ, তারা স্পষ্টতই আশঙ্কা করেছিল যে, বিদেশের মাটিতে তাদের যুদ্ধাপরাধ করার প্রবণতা হয়তো একদিন বিচার প্রক্রিয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে। বাস্তবে হয়েছেও তাই!

প্রায় চার দশক আগে তৎকালীন সিনেটর জো বাইডেন কংগ্রেসে বলেছিলেন যে, ইসরাইল হলো 'আমাদের হাতে তৈরি সেরা ৩ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ'। এই কথাতে এটা প্রমাণ হয় যে, যদি ইসরাইল না থাকত, তাহলে এই অঞ্চলে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে 'একটি নতুন ইসরাইল' সৃষ্টি করার দরকার পড়ত! অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে একটি অপরিহার্য 'কৌশলগত সম্পদ' হিসেবেই বিবেচনা করে থাকে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এ কারণেই বিপুল সামরিক সহায়তাসহ মার্কিন বৈদেশিক সাহায্যের সবচেয়ে বড় অংশই যায় তেলআবিবের হাতে। উপরন্তু, এটাই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে যে, ওয়াশিংটন ইসরাইলকে যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের মতো অস্ত্র সরবরাহ করে যাবে, কিন্তু সেই অপরাধের জবাবদিহি করার চেষ্টা করলে পালটা তাকেই হুমকির মুখে পড়তে হবে।

অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোও যুক্তরাষ্ট্রের পথ অনুসরণ করে। ইতালি আইসিসির সদস্য রাষ্ট্র, কিন্তু তারা নেতানিয়াহুকে আশ্বস্ত করে আদালতকে এভাবে দুর্বল করার সিদ্ধান্ত নেয় যে, তিনি ইতালি পরিদর্শনে গেলেও গ্রেফতারের মুখোমুখি হবেন না। ফ্রান্সও তা-ই করেছিল। তারা আইসিসি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করা সত্ত্বেও নিজের নাগরিকের পক্ষে আইনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, প্রশ্ন উঠতে পারে—মৌলিক উদারনৈতিক মতবাদগুলোর মধ্যে কি আন্তর্জাতিক আইনের শাসন এবং বিচারের নিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা নয়?

অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান, পশ্চিমা উদারপন্থিরা হয় ইসরাইলের প্রত্যক্ষ গণহত্যাকে ন্যায্যতা দিতে বা ধামাচাপা দিতে চাইছে, অথবা ফাঁপা, হাতের নখ কামড়ানো বক্তব্য দিচ্ছে। তাদের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা যেন গাজা যুদ্ধে গুঁড়িয়ে যাওয়া ভূমিতে চাপা পড়ে গেছে। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরাইলের প্রতিদিনকার নৃশংসতা দেখেছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেই দেশটির অর্ধেক জনসংখ্যা মনে করে, এখানে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং, আর কেউ কি মানবাধিকার বা 'নিয়মভিত্তিক শৃঙ্খলা' নিয়ে পশ্চিমের উপদেশ গ্রহণ করতে চাইবে?

মূলত, বারবার আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি পশ্চিমের অবজ্ঞা তাদের জন্য একটি কৌশলগত বিপর্যয় হিসেবে ফিরে এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন অভিজাতরা নিজেদের বোঝালেন যে, 'মার্কিন সামরিক শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।' এই বিশ্বাসই ইরাকে অবৈধ আগ্রাসন শুরু করতে সাহায্য করেছিল। তবে তা ওয়াশিংটনের অপরাজেয় শক্তির আভা নষ্ট করে দেয় এবং পশ্চিমের অনুমিত নৈতিক কর্তৃত্বকে করে দেয় ছিন্নভিন্ন। ইরাকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি এই অবজ্ঞা পরবর্তীকালে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পুতিনের আগ্রাসনের পথ পরিষ্কার করতে সাহায্য করেছিল। একইভাবে আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সংঘটিত যুদ্ধাপরাধগুলো ক্ষোভের জন্ম দেয়, যা তালেবানকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এক ভয়াবহ সামরিক ও কৌশলগত অপমানের মধ্য দিয়ে।

আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থা সব সময় পশ্চিমের অনুকূলেই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা যে সাহস করে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে পশ্চিমা মিত্রের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনেছে, তা একটি ভিন্ন গল্প বলে। গ্লোবাল সাউথের বেশির ভাগ দেশ এবং স্পেনের মতো ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকেও এটি সমর্থন পেয়েছে। ফলে যারা আইনকে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করে, সেই বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মার্কিন বা পশ্চিমা আধিপত্যবাদের এই পতন থামানো যাবে না। এটি বরং আরো দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমের অহংকারই যেন একবিংশ শতাব্দীতে তার ক্ষমতাকে পতনের দারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। পানি আরো বহু দূর অবধি গড়াবে।

● লেখক : দ্য গার্ডিয়ানের কলামিস্ট

দ্য গার্ডিয়ান থেকে অনূদিত

CamScanner

কপ-৩০ : একটি পর্যালোচনা

বিধান চন্দ্র দাস

প্যাকেজে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আরো বেশি আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা নিঃসন্দেহে আশা-জাগানিয়া। এই চুক্তির হতাশার দিক হলো, চূড়ান্ত চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই

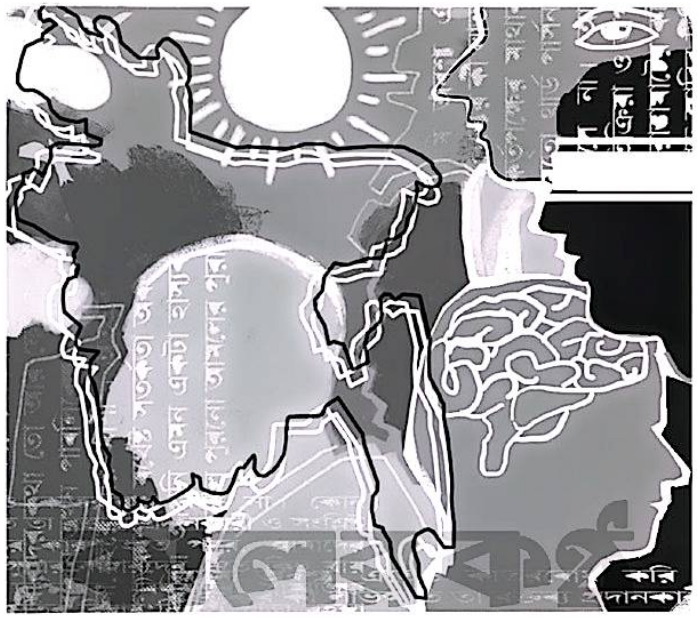

অবশেষে কপ-৩০-এ অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি চুক্তি সম্পাদন করতে সমর্থ হলেন। তবে কপ-৩০-এর জন্য নির্ধারিত তারিখের (১০-২১ নভেম্বর ২০২৫) মধ্যে এটি করা সম্ভব হয়নি। অতীতেও কয়েকবার কপের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেই চুক্তি হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে এটি নতুন কোনো ঘটনা নয়। এবার যে কারণগুলোর জন্য চুক্তি সম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে সময়ের বাইরে গড়াল, সেগুলো হচ্ছে–১. খসড়া প্রস্তাবে জীবাশ্ম জ্বালানি পরিবর্তনের রোডম্যাপ না থাকা; ২. বিনিয়োগ ও অভিযোজন তহবিল নিয়ে মতবৈষম্য; ৩. মূল সম্মেলনস্থলে অগ্নিকাণ্ড এবং ৪. লবিং ও শিল্প প্রভাব ইত্যাদি।

তবে অনেক রশি টানাটানির পরও 'বেলেম রাজনৈতিক প্যাকেজ' নামে ২৯টি সিদ্ধান্তযুক্ত একটি প্যাকেজ পাস করা সম্ভব হয়েছে। প্যাকেজে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে ১. উষ্ণমণ্ডলীয় বন ও আদিবাসী অধিকারভিত্তিক বৈশ্বিক জলবায়ু সংহতি; ২. প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ; ৩. অভিযোজন অর্থায়ন বৃদ্ধির অঙ্গীকার; ৪. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কাঠামো শক্তিশালীকরণ; ৫. জলবায়ুনীতিতে লিঙ্গসমতা পদক্ষেপ এবং ৬. জলবায়ুবান্ধব ন্যায্য বাণিজ্য ও সবুজ অর্থনীতির দিকে রূপান্তরের নীতি উল্লেখযোগ্য।

প্যাকেজে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আরো বেশি আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা নিঃসন্দেহে আশা-জাগানিয়া। এর ফলে চরম আবহাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পক্ষে প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হবে। এই সহায়তার মূল লক্ষ্য হলো, অভিযোজন অর্থায়নকে তিন গুণ (১২০ বিলিয়ন ডলারের আশপাশে) করা। তবে এই লক্ষ্যের সময়সীমা ২০৩৫ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। চুক্তিতে সবুজ অর্থনীতির দিকে ন্যায্য পরিবর্তনের জন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণে সব দেশ একমত হয়েছে।

এই চুক্তির হতাশার দিক হলো, চূড়ান্ত চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। মূল খসড়া চুক্তিতে রূপান্তরের কথা বলা হলেও শক্তিশালী তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো এবং অন্যান্য বড় নিঃসরণকারী দেশের তীব্র আপত্তির কারণে চূড়ান্ত পাঠ্যটিতে সেই ভাষাটিকে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে পরিবেশবান্ধব জ্বালানিতে রূপান্তরপ্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মানুষের ভাগ্য ও সময়সীমা নিয়ে নির্দিষ্ট রোডম্যাপ চুক্তিতে অনুপস্থিত। এটি মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পকে ঘিরে থাকা বিশাল প্রভাব এবং লবিংয়ের ফল। বন উজাড় সংক্রান্ত রোডম্যাপও বাদ পড়েছে। জলবায়ু অর্থায়নের সময়সীমা নিয়েও অনেকে হতাশা প্রকাশ করেছেন। গার্ডিয়ান বলেছে, 'দুর্বল ও আপসকামী চুক্তি বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুব সামান্যই কাজ করবে।' রয়টার্স লিখেছে, 'জীবাশ্ম জ্বালানিকে এড়িয়ে কপ-৩০-এ অস্তিকের জলবায়ু চুক্তি অনুমোদিত।' বিবিসি বলেছে, 'কপ-৩০ চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানির উল্লেখ নেই।'

এবারের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের ৩০তম অধিবেশন (কপ-৩০) ব্রাজিলের উত্তরাঞ্চলের রাজ্য 'পারা'-র রাজধানী 'বেলেম'-এ গত ১০ থেকে ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারের এই সম্মেলনটি অনেক কারণে ঘটনাবহুল সম্মেলন বলা যায়। বিশেষ করে এবারের এই সম্মেলনে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ইত্যাদির মাত্রা; প্যাভিলিয়নে আগুন লাগা, নতুন প্রতিপাদ্য ও উদ্যোগ এবং এ ধরনের বৈশ্বিক সম্মেলনের জন্য বেলেমের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাসহ বেশ কিছু বিষয়ের বিবেচনায় কপ-৩০কে ব্যতিক্রমধর্মী বলে অভিহিত করা যায়।

এবার মূল সম্মেলনের বাইরে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ (আদিবাসী, স্থানীয় সম্প্রদায়, কৃষক, শ্রমিক, সামাজিক ও পরিবেশ সংগঠন) একসঙ্গে হয়ে কথোপকথন, কর্মশালা ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে 'পিপলস সামিট' অর্থাৎ সিভিল সোসাইটি এবং সামাজিক জনগোষ্ঠীর সম্মেলন (১২-১৫ নভেম্বর ২০২৫) সম্পন্ন করেছে। এর জন্য নগর ও নদীর মধ্য দিয়ে গণমিছিল, অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম, নৌ শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপকভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। তাদের মূল দাবি ছিল–জলবায়ু ন্যায্যতা, ভূমি অধিকার, বন ও বন্যজীবন সংরক্ষণ, ন্যায্য রূপান্তর (কয়লা-গ্যাস সেক্টরে কাজ করা মানুষকে পরিবর্তিত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা), জলবায়ু পরিবর্তনের মিথ্যা সমাধান (কার্বন বাজার ও প্রযুক্তিগত সমাধান) প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি।

কপের ইতিহাসে এই প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন নির্গমনকারী দেশ) কোনো সরকারি প্রতিনিধিদল কপ সম্মেলনে পাঠায়নি। এটিও একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা, যদিও সে দেশ থেকে বেসরকারিভাবে কিছু ব্যক্তি ও সংস্থা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সম্মেলনের ৯ মাস আগে (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) কপ-৩০-এর প্রেসিডেন্ট মি. লাগো জনসমক্ষে দেওয়া এক বক্তব্যে বলেছিলেন, 'বেলেমে অনুষ্ঠেয় কপ-৩০ গতানুগতিক হতে পারে না–এটিকে অবশ্যই একটি ভিন্ন কপ হতে হবে।' উপরোক্ত ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাগুলোর সূত্র ধরে কেউ হয়তো কপ-৩০ ভিন্ন হয়েছে বলে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতেই পারেন। কিন্তু তার পরও কপ-৩০-এর মাধ্যমে কিছু ইতিবাচক বিষয় অবশ্যই অর্জিত হয়েছে, তা বলা যায়।

প্রথমত, কপ-৩০ সম্মেলন বেলেমে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমাজন ও প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে। সম্মেলনে উষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে (ব্রাজিল, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ইকুয়েডর, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো) আদিবাসী ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভূমি অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন হেক্টর জমির অধিকার স্বীকৃতির জন্য বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ব্রাজিল সরকারের তত্ত্বাবধানে সে দেশের বন সংরক্ষণ ও বনভিত্তিক অর্থনীতির জন্য ২০২৭ সালের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি তহবিল সংগ্রহের অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা আগের লক্ষ্যের দ্বিগুণেরও বেশি। এ ছাড়া ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ফরএভার ফ্যাসিলিটি (টিএফএফএফ) নামে নতুন একটি আর্থিক উদ্যোগ (ফান্ড) আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে। এই অর্থ মূলত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন থাকা দেশগুলোকে বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধে উৎসাহিত করতে ব্যয় করা হবে। এটি একটি 'পে ফর পারফরম্যান্স' মডেল এবং এটি স্যাটেলাইট ডেটার মাধ্যমে বন সংরক্ষণের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করবে।

দ্বিতীয়ত, কপ-৩০-এ প্রতিশ্রুতির তুলনায় বাস্তবায়ন এবং কার্যকর অর্থায়নের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ক্লিন এনার্জি ও গ্রিড (স্মার্ট গ্রিড, নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিকাঠামো এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর আধুনিকীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিনিয়োগে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থাগুলোর যৌথ অঙ্গীকারে বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ গ্রিড ও দূষণহীন শক্তিতে মোট এক ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি অবশ্যই বাস্তবায়নমুখী রূপান্তরের সূচক। পাশাপাশি একটি বৈশ্বিক উদ্যোগের মাধ্যমে সুহায়ী জ্বালানি চার গুণ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও (বেলেম কমিটমেন্ট ফর সাসটেইনেবল ফিউয়েলস) গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জলবায়ু সহনশীল করতে 'ক্লাইমেট প্রুফিং এসএমইএস ক্যাম্পেইন' চালু করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় যে কপ-৩০ জলবায়ুনীতিকে কেবল আলোচনা নয়, বরং একে কার্যকরভাবে প্রয়োগ, অর্থায়ন এবং রূপান্তরমুখী শক্তি খাত উন্নয়নের বাস্তব ধারায় নিয়ে এসেছে।

তৃতীয়ত, কপ-৩০-এ মহাসাগর ও খাদ্যব্যবস্থাকে জলবায়ু আলোচনার মূলধারায় আনার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে। ব্রাজিল ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে নতুন 'ওশান ট্যাস্কফোর্স' ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর লক্ষ্য হলো সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, সমুদ্রভিত্তিক সমাধান ও নীল অর্থনীতিকে জলবায়ু কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে আরো সুসংহতভাবে যুক্ত করা। একই সঙ্গে কৃষি খাতের নির্গমন হ্রাস ও পুষ্টি-দক্ষতা বাড়াতে 'বেলেম ডিক্লারেশন অন ফার্টিলাইজার্স' গৃহীত হয়েছে। এর ফলে বৈশ্বিক সার উৎপাদন ও ব্যবহারে নির্গমন কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে কপ-৩০ শুধু শক্তি খাত নয়, বরং সমুদ্র, কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থাকেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশলগত অংশ হিসেবে বিবেচনায় এনেছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্থাৎ চুক্তি এবং সংঘটিত ঘটনাগুলো বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে কপ-৩০ বিশ্বকে আশা আর হতাশার মিশ্র এক চিত্র উপহার দিয়েছে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

শেয়ার বিজ

খেলাপি ঋণ সমস্যা ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও কম নয়

মো. মাঈন উদ্দীন

নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে পুরো আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতে খেলাপি ঋণ বছরের পর বছর ধরে বেড়েই চলেছে। এতে পুরো খাতের লোকসানও বেড়েছে অনেক। প্রায় একটানা ছয় বছর ধরে লোকসানে রয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত একটানা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে লোকসান গুনতে হচ্ছে। ২০১৯ সালে এই খাতের সম্মিলিত লোকসান করে ২ হাজার ২২০ কোটি টাকা। আর ২০২৪ সালে লোকসান আরও বেড়ে হয় ৩ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, দেশে বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩৫টি। এর মধ্যে ২২টি দেশীয় মালিকানাধীন। ১৩টি দেশি ও বিদেশি যৌথ মালিকানাধীন। এর মধ্যে উচ্চ খেলাপি ঋণ ও টাকা ফেরত দিতে না পারা ২০টি প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক নোটিশ দিয়েছে কেন বন্ধ করা হবে না জানতে চেয়ে। এর মধ্যে ১১টি প্রতিষ্ঠান তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিয়েছে। বাকি ৯টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকারের পক্ষ থেকেও এতে সায় এসেছে। এই ৯টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের পর আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে তহবিল গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো—এফএএস ফাইন্যান্স, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি (বিআইএফসি), পিপলস লিজিং, ইস্টারন্যাশনাল লিজিং, আভিভা ফাইন্যান্স, প্রিমিয়ার লিজিং, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, জিএসপি ফাইন্যান্স ও প্রাইম ফাইন্যান্স। ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক খাতের এই দুরবস্থার শুরু মূলত ২০১৪ সালে, পি কে হালদারের হাত ধরে। আর ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসহ প্রায় ১১টি ব্যাংক পড়ে এস আলম নামক আর এক বড় মাফিয়ার কবলে। বাংলাদেশে প্রায় দুই দশকে যে অলিগার্কিক পুঁজিবাদ বা ব্যাংক ডাকাতদের শাসন দেখা দিল, তাদেরও মাফিয়া বলতে হচ্ছে। এক ব্যক্তির হাতে ১১টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়ার উদাহরণ সম্ভবত বিশ্বের আর কোনো দেশে নেই। এস আলমের মতো নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আরেক মাফিয়া হল পি কে হালদার। সে চারটি প্রতিষ্ঠানকে নামে-বেনামে নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরে একে একে এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নামে-বেনামে বিপুল ঋণ বের করে নেয়। পরে দখল করা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের নামে টাকাও সরিয়ে নেন। এমনকি দেশের বাইরেও অর্থ পাচার করে কোম্পানি খোলেন। তার দখল করা প্রতিষ্ঠান চারটি ছিল ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি (বিআইএফসি)। সেই চার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা এখন চরম খারাপ। আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে পারছে না এসব প্রতিষ্ঠান। অথচ পি কে হালদার ভারতে গ্রেপ্তার হলেও পরবর্তী সময়ে জামিনে মুক্ত হয়ে যায়। সে এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবে সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান খারাপ অবস্থানে নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের করা টেকসই রেটিংসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নেও সেরা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিও পেয়েছে এ খাতের একাধিক প্রতিষ্ঠান। দেশের অর্থনীতি, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উন্নয়নে এসব প্রতিষ্ঠান জোরালো ভূমিকাও রাখছে। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সৌরবিদ্যুৎ খাতে অবদান রেখে চলেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আইডিএলসি ফাইন্যান্স, আইপিডিসি ফাইন্যান্স, ডিবিএইচ ফাইন্যান্স ও ন্যাশনাল হাউজিং অন্যতম। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর দৃশ্যমান যে উন্নতি হয়েছে তার বেশির ভাগই হয়েছে অর্থনীতিতেই। ব্যাংক ও আর্থিক খাতে বেশ কিছু সিদ্ধান্তের কারণে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তেমন অগ্রগতি দৃশ্যমান হয়নি। যতটুকু হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত তা কতটা টেকসই হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য থেকে জানা যায়, সব মিলিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের ৪৮ হাজার ৯৬৬ কোটি টাকা আমানত এবং অন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ ১৮ হাজার ৬১৩ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট আমানতের মধ্যে সমস্যাগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের আমানত ২২ হাজার ১২৭ কোটি টাকা এবং অন্য ব্যাংক-আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া ধার পাঁচ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে খারাপ প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যক্তি আমানত রয়েছে পাঁচ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭৮৯ কোটি টাকা আমানতের বিপরীতে ঋণ নিয়েছেন গ্রাহক। এতে নিট ব্যক্তি আমানত চার হাজার ৯৭১ কোটি টাকা। দুর্বল ও লোকসানে পতিত প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন বা একীভূতকরণের জন্য প্রাথমিকভাবে ৪ হাজার ৯৭১ কোটি টাকার তহবিল দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে যে মাফিয়া আর্থিক খাতকে জিম্মি করে রেখেছে তার থেকে 'মাফিয়া অর্থনীতি' দমন ও তার থেকে মুক্ত হওয়া এতটা সহজ নয়। এজন্য অর্থনীতিকে এক ধরনের মূল্য দিতে হয়; অর্থনীতির গতি কমে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের আর্থিক খাত। অল্প সময়ে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ নয়। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর ভালো কিছু হতে পারত। কিছুই হয়নি। চাঁদা বন্ধ হয়নি, কেবল চাঁদাবাজের পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ শক্তি প্রদর্শনের কাঠামোর কোনো বদল হয়নি, কেবল কিছু ব্যক্তির পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে না। আমানতকারীরা এ দশা থেকে মুক্ত হতে চায়। দীর্ঘদিনের অবহেলা এবং স্বল্পমেয়াদি আমানতের ওপর নির্ভর করে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়ার কারণে সম্পদ-দায়বদ্ধতার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। এই খাত পুনরুদ্ধারের জন্য একটি শক্তিশালী শেয়ারবাজার ও বন্ড মার্কেট অপরিহার্য। লাভজনক ও কাঠামোগত দিক দিয়ে সক্ষম নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে সরকারের মনিটরিং আওতায় এনে আরও কার্যকরী ও গতিশীল করা যেতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আমানতদারীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারকে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

ব্যাংকার, মুক্ত লেখক
main706@gmail.com

CamScanner

শেয়ার বিজ

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা

শামছুদ্দোহা তোহা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোয় ছোট ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের (এমএসএমই) অবদান অনস্বীকার্য। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহায়ক নয়, তারা সমাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ায় এবং আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এগুলোর পেছনে যে শক্তি, যেটি তাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়, তা হলো মূলধন—অর্থ। আর সেখানেই এসে দাঁড়ায় ব্যাংক ঋণ। তবে ঋণ পাওয়া যে এতটা সহজ, তা কিন্তু নয়।

ব্যাংক ঋণ পাওয়া একটা খুব জটিল প্রক্রিয়া, বিশেষত এসএমই এবং এমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য। কেউ ঋণ নিতে গেলে শুধু কিছু কাগজপত্র জমা দিলেই হবে না। চাই পরিষ্কার উদ্দেশ্য, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং পরিশোধের একটি শক্তিশালী রূপরেখা। কারণ, ব্যাংক ঋণ দেয়ার আগে একাধিক বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়। প্রশ্ন একটাই—'আপনি কেন ঋণ নিচ্ছেন?' এই প্রশ্নের উত্তর কেবল ঋণপ্রাপ্তির পথ সহজ করে না, বরং ব্যাংকের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনেও সাহায্য করে।

ধরা যাক একজন উদ্যোক্তা ঋণ নিতে চান। ব্যাংক যখন তাকে জিজ্ঞেস করে, 'ঋণ নেয়ার উদ্দেশ্য কী?' তখন কেমন হয় যদি জানানো হয়, 'আমি শুধু ঋণ নিতে চাই'। এ উত্তর কি যথেষ্ট? ঋণের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে ঋণটি খরচ করা হবে, সেটা কি ব্যবসার বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি বা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে সহায়ক হবে—এসব জবাব ব্যাংক জানতে চায়।

একটি উদাহরণ। মি. আলী, একজন উদ্যোক্তা, তিনি একটি কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুতকারী ছোট প্রতিষ্ঠান চালান। তার ব্যবসার উন্নতির জন্য তিনি ঋণ নিতে চাচ্ছেন। খুব সহজভাবে তিনি বলেন, 'ঋণটি নতুন মেশিনারি কেনার জন্য ব্যবহার করব, যা উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ শতাংশ বাড়াবে।' এই স্পষ্টতার কারণে ব্যাংক তাকে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর যদি তিনি স্পেসিসিক কারণ উল্লেখ না করে বলেন, 'ঋণটি আমি কিছু কাজে খরচ করব,' তবে ব্যাংক হয়তো দ্বিধা করবে।

ঋণ পাওয়ার জন্য প্রথমে উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা জরুরি, তারপর পরিশোধের পরিকল্পনা। কারণ ব্যাংক ঋণ দেয়ার পর, তারা জানতে চায়, ঋণগ্রহীতা কীভাবে এবং কখন ঋণ পরিশোধ করবেন। একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, যা ঋণগ্রহীতার আয় বা নগদ অর্থের প্রবাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ব্যাংককে উদ্বেগমুক্ত করে এবং ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়।

ধরা যাক, মি. শামিম একটি ছোট চা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান চালান। তিনি ঋণ নিতে চান নতুন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য, যাতে উৎপাদন ২০ শতাংশ বাড়ানো যায়। তার পরিকল্পনা স্পষ্ট 'নতুন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আয় বাড়িয়ে, ঋণের মাসিক কিস্তি ১৫ হাজার টাকা পরিশোধ করা হবে।' এখন যদি ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত হয় এবং এটি তার ব্যবসার বর্তমান আয় এবং ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে ব্যাংক ঋণ দিতে আগ্রহী হবে। এখানে ব্যাংক শুধু ঋণের পরিমাণ এবং শর্তাবলি দেখবে না, বরং ঋণ পরিশোধের বাস্তবতা এবং যে পরিকল্পনা থাকবে সেটি কতটুকু কার্যকর হবে—এটি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করবে।

এছাড়া সিআইবি (ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো) রিপোর্ট বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল। এই রিপোর্টে ঋণগ্রহীতার পূর্বের ঋণ পরিশোধের ইতিহাস, পেমেন্ট স্ট্যাটাস এবং বর্তমান আর্থিক অবস্থা দেখা যায়। সিআইবি রিপোর্টের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার ক্রেডিট স্কোর যাচাই করে এবং এর ভিত্তিতে ঋণ অনুমোদন বা অস্বীকার করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যাংকের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়।

উদাহরণস্বরূপ, মি. হাসান একটি ছোট গার্মেন্টস ব্যবসা পরিচালনা করছেন। কিন্তু যখন ব্যাংক তার সিআইবি প্রতিবেদন দেখে, তারা দেখতে পায় যে তিনি পূর্বে একটি ঋণ পরিশোধে সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন। এ কারণে ব্যাংক তাকে ঋণ দিতে একটু বেশি সময় নেয়। এছাড়া ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক গঠনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত ব্যাংকিং ব্যবহারের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের প্রতি আস্থা তৈরি করতে পারেন, যা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। ঋণ নিয়মিতভাবে পরিশোধ করতে হবে, ব্যবসার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যাংককে সঠিকভাবে জানাতে হবে এবং যদি কোনো সমস্যা হয়, তবে দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে। ব্যাংকের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তুললে ভবিষ্যতে ঋণ প্রাপ্তি আরও সহজ হয়ে যাবে। যেমন, মি. করিম দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছেন এবং সময়মতো ঋণ পরিশোধ করেছেন। যখন তিনি নতুন ঋণের জন্য আবেদন করেন, ব্যাংক তার আগের ঋণ পরিশোধের ইতিহাস দেখে এবং সহজেই ঋণ অনুমোদন করে।

এসএমই এবং এমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়া আসলেই চ্যালেঞ্জিং। তবে যদি ঋণগ্রহীতা সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেন, পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং সম্পর্ক তৈরি করেন, তবে ঋণগ্রহীতা নিয়মিতভাবে সেই চ্যালেঞ্জগুলো সহজে মোকাবিলা করতে পারবেন। ঋণগ্রহীতা যদি স্পষ্টভাবে ঋণের উদ্দেশ্য জানিয়ে দেন, যদি ঋণগ্রহীতার পরিশোধ পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত হয় এবং যদি ব্যাংক ঋণগ্রহীতার সিআইবি প্রতিবেদনে কোনো অসঙ্গতি না পায়, তাহলে ঋণ পাওয়া কঠিন হবে না।

এটি মনে রাখতে হবে, ঋণ পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুধু কাগজপত্র জমা দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত, একটি বিশাল পরিকল্পনার অংশ। শুধু ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং ঋণগ্রহীতার ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিন, পরিষ্কারভাবে পরিকল্পনা করুন এবং ব্যাংকের সঙ্গে একটি বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়ে তুলুন। তবেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পাওয়ার পথে সফল হবেন এবং সর্বদা মনে রাখতে হবে 'সঠিক প্রস্তুতি, বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা এবং সম্পর্কের গুরুত্ব জানলেই ঋণগ্রহীতা সফল হতে পারবেন।'

প্রিন্সিপাল অফিসার, মধুমতি ব্যাংক পিএলসি

CamScanner

A banking sector ravaged by bad loans

With non-performing loans (NPLs) currently standing at an unbelievable Tk644,515 crore, making up almost 36% of all loans, to say that the time for complacency is over is, at this point, comical.

The latest Bangladesh Bank report reveals a staggering escalation: In just one year, defaults have more than doubled from Tk285,000 crore to Tk644,515 crore, an increase of about Tk360,000.

This is beyond catastrophic.

Now, while it is unquestionable that it is the 16 years of misrule and impunity that was perpetuated by the previous regime that has led to such escalation, what is also true is that certain businesses and individuals continue to get away with what can only be described as robbing our banks and financial institutions.

Experts rightfully point to years of weak supervision, political interference, and reckless rescheduling practices as the root causes, but we expect things to turn for the better, not the worse. At this stage, the very foundation of financial stability is all but missing from our nation and has undermined depositor confidence.

It is the shocking collapse of accountability that is arguably even more alarming, and has been a major factor as to why defaulters continue to be emboldened. As always, while these nefarious entities enjoy the millions and billions they have taken from our banks, it is honest borrowers and depositors who are left to bear the cost.

This normalization of bad loans cannot continue

This normalization of bad loans cannot continue. Unless strict measures - chief of which is ending the impunity and lack of accountability for defaulters along with stronger regulatory oversight - are enacted immediately, there appears to be no hope for our financial sector.

This continued escalation of non-performing loans is akin to a bad dream that is eating away at any semblance of credibility our economy has. We must act - decisively, transparently, and urgently.

CamScanner

এলডিসি উত্তরণের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

ড. মো. আইনুল ইসলাম

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়া বর্তমানে দ্বিধাদ্বন্দ্বকর প্রেক্ষাপটে এসে দাঁড়িয়েছে। যেখানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সতর্কবার্তা ও দেশীয় বেসরকারি খাত ও বিশেষজ্ঞদের গভীর উদ্বেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাতিসংঘের উচ্চ প্রতিনিধি দপ্তরের একটি তিন সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসে উত্তরণ প্রস্তুতির বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন শুরু করে। গুলশানে জাতিসংঘ ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ব্যবসায়ী সংগঠন, রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও নীতিগবেষকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রতিনিধিদল জানতে চায়- এলডিসি-উত্তরণ পরবর্তী বাস্তবতা মোকাবিলায় বেসরকারি খাতের প্রস্তুতি কতটা। এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যবসায়ী নেতারা জানিয়েছেন, সরকারের স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজির (এসটিএস) বাস্তবায়ন অত্যন্ত ধীর এবং আগামী এক বছরের মধ্যে পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাদের মতে, গত কয়েক বছরে এসটিএস বাস্তবায়নের অগ্রগতি খুবই সীমিত এবং রপ্তানি খাত এখনও একক পণ্যের ওপর নির্ভরশীল ও বাজারের বৈচিত্র্য নেই। এই প্রেক্ষাপটে গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাংলাদেশের অনুরোধে ঘোষণা দেন যে, এলডিসি উত্তরণ প্রস্তুতি মূল্যায়নে একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক-স্থানীয় যৌথ মূল্যায়ন ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে শেষ হবে, যাতে সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সরকারের প্রধান উপদেষ্টাও এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। সবদিক পর্যালোচনা করে ২০২৬ সালে এলডিসি উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য কতটা উপকারের কিংবা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে তা আসলেই গুরুতর ভাবনার বিষয়।

নির্বাচিত উন্নয়নশীল দেশ বা এলডিসি থেকে উত্তরণের পথে বাংলাদেশ আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ২০২৬ সালের সম্ভাব্য গ্র্যাজুয়েশনের পর আন্তর্জাতিক বাজারে যে কৃত্রিম সুবিধাগুলো বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করে আসছে, সেগুলো ধীরে ধীরে হারাতে হবে। এই রূপান্তরকালীন পর্বে অর্থনীতির মৌলিক তত্ত্ব এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য অমূল্য নির্দেশিকা হয়ে উঠতে পারে। অর্থনীতির ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব 'তুলনামূলক সুবিধা' বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণের প্রেক্ষাপটে গভীর তাৎপর্য বহন করে। এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ এক ধরনের 'কৃত্রিম তুলনামূলক সুবিধা' ভোগ করেছে, যা দেশের নিজস্ব উৎপাদনশীলতা বা দক্ষতার চেয়ে আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণী কাঠামোর সুবাদে সৃষ্ট। শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার, মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত শিথিলতা এবং স্বল্প মজুরিভিত্তিক শ্রমই এর মূল ভিত্তি ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'এভরিথিং বাট আর্মস'-এর আওতায় শূন্য শুল্কে পোশাক রপ্তানি কিংবা ট্রিপস চুক্তির ছাড় পাওয়ায় জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন এই কৃত্রিম সুবিধারই উদাহরণ। কিন্তু এলডিসি উত্তরণের পর এই ছাতার আওতা সংকুচিত হবে। তখন টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে একটি 'টেকসই তুলনামূলক সুবিধা'। এই টেকসই ভিত্তির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, যার জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তির ব্যাপক অনুপ্রবেশ, স্বয়ংক্রিয়করণ এবং মানসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমশক্তিকে রূপান্তর।

বাংলাদেশের জন্য চীনের অর্থনৈতিক উত্থান একটি গভীরভাবে শিক্ষণীয় কেস স্টাডি, যা অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর তত্ত্ব এবং রাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন মডেলের কার্যকারিতা প্রমাণ করে। চীন তার শিল্পকৌশল প্রণয়নে শুধু তুলনামূলক সুবিধার ওপরই নির্ভর করেনি, বরং গতিশীল তুলনামূলক সুবিধা সৃষ্টির জন্য সক্রিয় নীতি গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তারা প্রথমে হালকা শিল্পে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, এর পর ধাপে ধাপে পুঁজি ও প্রযুক্তিনিবিড় ভারী শিল্প এবং বর্তমানে হাইটেক ও উদ্ভাবনভিত্তিক শিল্পের দিকে সফল রূপান্তর সম্পন্ন করেছে। এই যাত্রাপথে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, যা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বৈদেশিক আকর্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। এখানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও বাজার অর্থনীতির সমন্বয় ঘটেছে, যেখানে সরকার কৌশলগত পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকির মাধ্যমে শিল্পায়নের গতিপথ নির্দেশ করেছে। বাংলাদেশের জন্য চীনের মডেল থেকে প্রাপ্ত মূল শিক্ষা হলো দীর্ঘমেয়াদি ও পর্যায়ক্রমিক শিল্পনীতির গুরুত্ব, যেখানে রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং গুণগত উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি।

এলডিসি থেকে সফল উত্তরণের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ ভুটান বাংলাদেশের জন্য একটি গুণগত মডেল উপহার দিয়েছে। ভুটানের মডেলের মর্মমূলে রয়েছে শাসনকেন্দ্রিক প্রস্তুতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা। অর্থনৈতিকভাবে তারা তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে জলবিদ্যুৎ রপ্তানির ওপর একটি স্থিতিশীল বৈদেশিক মুদ্রার উৎস গড়ে তুলেছে, যা পর্যটন ও কৃষির অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় শক্ত ভিত দিয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এখানে শিক্ষা হলো, পোশাক খাতের ওপর একক নির্ভরতা কমিয়ে ফার্মাসিউটিক্যাল, আইটি-সেবা এবং কৃষি-প্রক্রিয়াকরণের মতো খাতগুলোতে বিকল্প ও স্থিতিশীল রপ্তানি আয়ের উৎস সৃষ্টি করা। এখানে কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে অত্যন্ত কম উচ্চারিত কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিষয়ে দু-চারটি কথা বলা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ খাত দেশের অর্থনীতিতে একটি দ্রুতবর্ধনশীল ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। বর্তমানে দেশের কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ বাজারের আকার প্রায় ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে প্রসারিত হচ্ছে। এ খাত জিডিপিতে সরাসরি অবদান রাখার পাশাপাশি রপ্তানি বৈচিত্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ খাত শুধু দেশীয় সরবরাহই নয়, বৈশ্বিক বাজারেও বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। এ ক্ষেত্রে ভুটানের উদাহরণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কৃষি প্রক্রিয়াকরণই ভুটানের এলডিসি সফল-উত্তরণে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে ভুটান উত্তরণের আগেই তার প্রধান আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে বাজার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সক্রিয় কূটনীতি চালিয়েছে। পাশাপাশি, সরকারি আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানো তাদের রূপান্তরকে মসৃণ করেছে। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি সময়োপযোগী বার্তা বহন করে- ভারতের সঙ্গে সিইপিএসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং অভ্যন্তরীণভাবে আমলাতান্ত্রিক সংস্কার ও স্বচ্ছতা বাড়িয়ে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশের জন্য এর সরাসরি অভিঘাত হলো, শুধু জিএসপি+ সুবিধা ধরে রাখার আশায় না থেকে চীন, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং আসিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে দ্রুত ও কার্যকর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিল্পক্ষেত্রে ভিয়েতনাম কৌশলগতভাবে বৈদেশিক আকর্ষণ করেছে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিকস ও হাইটেক খাতে। তারা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলে রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। বাংলাদেশেরও পোশাক শিল্পে স্বয়ংক্রিয়তা এবং উচ্চপ্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদনের দিকে ঝুঁকতে হবে। একই সঙ্গে, আইটি ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতকে বাড়তি প্রণোদনা দিয়ে বিকশিত করার মাধ্যমে রপ্তানি বাস্কেটকে বৈচিত্র্যময় করতে হবে।

পরিশেষে বলতে হয়, এলডিসি উত্তরণ একটি প্রবেশপত্র; একটি অর্জন। কিন্তু এর সঙ্গে আসে চ্যালেঞ্জ ও দায়িত্বের এক ভারী বোঝা। ভুটান, ভিয়েতনাম ও চীনের অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায় যে, এই উত্তরণকে শুধু 'সুবিধা হারানোর' আতঙ্ক হিসেবে না দেখে 'আত্মশক্তির বিকাশের' এক সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন হবে একটি সামগ্রিক রোডম্যাপ, যেখানে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনশীলতা ও শিল্পকাঠামোর রূপান্তরের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সক্রিয় ও দূরদর্শী কূটনীতি একই সুতায় বাঁধা পড়বে। বাংলাদেশের অর্থনীতি যদি এই দ্বিমুখী সংগ্রামে সফল হয়, তাহলেই কেবল এই উত্তরণ প্রকৃত অর্থে টেকসই উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

অর্থনীতির ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব 'তুলনামূলক সুবিধা' বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণের প্রেক্ষাপটে গভীর তাৎপর্য বহন করে। এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ এক ধরনের 'কৃত্রিম তুলনামূলক সুবিধা' ভোগ করেছে, যা দেশের নিজস্ব উৎপাদনশীলতা বা দক্ষতার চেয়ে আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণী কাঠামোর সুবাদে সৃষ্ট। শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার, মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত শিথিলতা এবং স্বল্প মজুরিভিত্তিক শ্রমই এর মূল ভিত্তি ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'এভরিথিং বাট আর্মস'-এর আওতায় শূন্য শুল্কে পোশাক রপ্তানি কিংবা ট্রিপস চুক্তির ছাড় পাওয়ায় জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন এই কৃত্রিম সুবিধারই উদাহরণ। কিন্তু এলডিসি উত্তরণের পর এই ছাতার আওতা সংকুচিত হবে। তখন টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে একটি 'টেকসই তুলনামূলক সুবিধা'

লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

চীন-জাপান সম্পর্কে উত্তেজনা

ড. ফরিদুল আলম

তাইওয়ান নিয়ে আবার নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, যার মাত্রা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। এবার এশিয়ায় শক্তিশালী দুই প্রতিবেশী চীন-জাপান একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে। তাইওয়ান নিয়ে চীনের অবস্থান এবং সেখানে চীনের সামরিক অভিযানের সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে গত ৭ নভেম্বর জাপানের সংসদে সে দেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি জানিয়েছিলেন যে চীন যদি তাইওয়ানেও হামলা পরিচালনা করে, তবে নিজেদের নিরাপত্তা শঙ্কা মোকাবেলার স্বার্থে তারাও সেখানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে। জাপানের এই ঘোষণাকে চীন গুরুত্বপূর্ণ হুমকি হিসেবে দেখছে এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাপানে ভ্রমণ পরিহার এবং চীনের শিক্ষার্থীদের জাপানে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

এই আহ্বানের পর কমপক্ষে সাতটি চীনা উড়োজাহাজ কম্পানি বিনা মাশুলে যাত্রীদের আগাম টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়ার কথা জানিয়েছে। জানা গেছে, এরই মধ্যে চীন থেকে জাপানগামী কয়েক লাখ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে চীন বা জাপান কার অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব পড়বে, সেটি আপাতত বলা না গেলেও এটি অনুমান করা দুরূহ নয় যে পরিস্থিতির যদি উন্নতি না হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই উভয় দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিষয়টি পুরোই নির্ভর করছে এই উত্তেজনা কত দিন চলবেএবং কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবেতার ওপর। চীনের ঘোষণার পর জাপানের পক্ষ থেকেও চীন সফররত জাপানি নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে জনসমাগমপূর্ণ এলাকা পরিহার করে চলতে বলা হয়েছে।

চীন ও জাপানের মধ্যে ঐতিহাসিক কিছু সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়েই এক ধরনের স্থিতাবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছে, যার জেরে উভয়ের পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি উল্লেখযোগ্যভাবেকাজ করে। চীনের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের অবদানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা জাপানের, দেশটিতে প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যায় জাপানি পর্যটক ভ্রমণ করেন। একই সঙ্গে জাপানও এই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে দেশটিতে এক লাখ ২০ হাজারের বেশি চীনা শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে, যা যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি। এর বাইরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক এশিয়ার অপরাপর দেশগুলোর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের তুলনায় সন্তোষজনক রয়েছে।

বর্তমান এই উত্তেজনা অতীতের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; যেমন- ১৯৪৯ সালের চীনা বিপ্লবের সময় জাপানের পক্ষ থেকে চীনের সরকারকে সমর্থন দেওয়া হয়নি, বরং তাইওয়ান নিয়ন্ত্রিত চীনকেই তারা সমর্থন করে যেতে থাকে। আরো একটু পেছনে তাকালে আমরা দেখব, ১৮৬৮ সালে জাপানে মিজি পুনরুদ্ধারের পর থেকে জাপান পশ্চিমা প্রভাববলয়ের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে নতুন বিরোধে জড়ায়, যার এক পর্যায়ে ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল, পরবর্তী সময়ে চীনের বিশাল এলাকা জাপানের নিয়ন্ত্রণে যাওয়া এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়ে জাপানের দখল থেকে মুক্ত হওয়াড়এই সবকিছু দুই দেশের সম্পর্কে স্বাভাবিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭২ সাল থেকে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের নতুন বোঝাপড়ার মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক করা হয়।

বাংলাদেশ বুলেটিন

১৯৭৮ সালে চীনের পুনর্গঠন নীতির ফলে এই সম্পর্কের আরো উন্নতি ঘটে এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে একে অপরের আরো কাছে আসে।

এই সময়ের পর থেকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে বড় ধরনের কোনো অস্বস্তি না থাকলেও ২০১০ সালে সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আবার সম্পর্কের কিছুটা অবনতি হলেও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের স্বার্থে তারা তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। জাপান কর্তৃক ব্যক্তিমালিকানায় থাকা দ্বীপপুঞ্জটি কিনে নিজেদের অংশে পরিণত করার পর থেকে চীন এটিকে নিজের বলে দাবি করে আসছিল। সম্প্রতি জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির তাইওয়ানবিষয়ক বক্তব্যের পর চীন সেখানে কোস্ট গার্ড পাঠিয়েছে এবং ড্রোন অভিযান পরিচালনা করেছে। দ্বীপটি পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত। এটি তাইওয়ানের উত্তর-পূর্বে, চীনের পূর্বে এবং জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। তাইওয়ান থেকে এর দূরত্ব মাত্র ১২০ নটিক্যাল মাইল। চীনের এই অবস্থান নতুন করে উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

আমাদের এখন বোঝা দরকার যে জাপানের পক্ষ থেকে যে বক্তব্যটি এসেছে, সেটিকে তারা নিজেরা কতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং এর সঙ্গে কি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না। আমরা জানি, জাপান ১৯৭২ সালের পর থেকে 'এক চীন' নীতিকে মেনে নিলেও তাইওয়ানের সঙ্গে তারা নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। এর পেছনে কিছু ঐতিহাসিক ও বাস্তবসম্মত কারণ রয়েছে। জাপান একসময় তাইওয়ান উপনিবেশের অংশ ছিল এবং পরবর্তী সময়ে তাইওয়ানের সংস্কৃতিতে জাপানের বড় ধরনের প্রভাবপরিলক্ষিত হয়। তাইওয়ান প্রশান্ত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চীন যদি সেখানে অভিযান পরিচালনা করে সফল হয়, তাহলে সেনকাকু দ্বীপসহ জাপানের নিরাপত্তার জন্য নিশ্চিতভাবেই সংকট সৃষ্টি করবেএবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণেও এটির প্রভাব পড়বে।

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে এবং এশিয়ার অর্থনীতিতে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে চীন ও জাপান উভয়েই একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। তাইওয়ানও প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে এবং জাপানের অর্থনীতিতে এর ভূমিকা অপরিসীম। এ ক্ষেত্রে চীনের আগ্রাসন প্রকারান্তরে জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থকেই বাধাগ্রস্ত করবে। তা ছাড়া তাইওয়ানের বাণিজ্যিক পথগুলোও জাপানের বিশ্ববাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবেচনায় জাপানের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে চলতে হলে তাইওয়ানকে কোনোভাবেই অস্থিতিশীল হতে এবং চীনের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেওয়া যাবেনা। এটিই হচ্ছে জাপানের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার যত কারণ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ করে কেনই বা জাপানের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এমন বক্তব্য এলো, যা এই নতুন উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গেলে এটি ধারণা করা যেতেই পারে যে তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের দীর্ঘ সময় ধরেই উত্তেজনাকর সম্পর্ক রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও জাপানের মতো 'এক চীন' নীতিকে সমর্থন করলেও তাইওয়ানের প্রতি তাদের সমর্থন বরাবরই পক্ষপাতদুষ্ট। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক করতে দেখেছি, সেই সঙ্গে একই সময়ে দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ায়ও সফর করেছেন তিনি। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক-পরবর্তী যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প জাপানের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা জানান দেন এই বলে যে জাপানের প্রয়োজনে সব ধরনের সমর্থন দেওয়া হবেযুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। চীনের আচরণে বোঝা যায় যে তারা জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কথার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পেরেছে, না হলে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর একটি কথাকে কেন্দ্র করে এমন আক্রমণাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অতীতের মতো চীন এটিই জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে যে তাইওয়ান নিয়ে চীনের চিন্তা-ভাবনার বাইরে কেউ যাওয়ার চেষ্টা করলে তারা যেকোনো সময় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। দুই পক্ষ যদি দ্রুততম সময়ে সংকট নিরসনে আলোচনায় না বসে, তাহলে হয়তো এই এলাকা অর্থাৎ তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগর ঘিরে দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোসহ আরো কৌশলগত অংশীজন চীনের বিরুদ্ধে একাট্টা হওয়ার চেষ্টা করবে। চীনের পক্ষ থেকেও হয়তো উত্তর কোরিয়ার শাসককে উসকে দেওয়ার চেষ্টা থাকতে পারে। এমনটি হলে অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন ধরনের অস্থিরতা শুরু হতে পারে অঞ্চলটি ঘিরে।

লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

সুদানে ট্রাম্প আশীর্বাদ না অভিশাপ

সাখাওয়াত হোসেন সুজন

লেখক
সাংবাদিক
mshossain.sujan@gmail.com

'দুধারি তলোয়ার' উপমাটি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি রূপক অর্থে এমন কোনো কিছু বোঝায়, যার দুই দিক ধারালো। অর্থাৎ এটি যেমন উপকার করতে পারে, অন্যদিকে ঠিক ততটাই ঝুঁকিপূর্ণ– বিশ্বের নানা গণমাধ্যম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এখন এভাবেই দেখছে। ট্রাম্প এখন অনেকটা অর্থকড়ির মতো দুধারি তলোয়ার। থাকলে সুখ, না থাকলেও সুখ। আবার থাকলেও অনেক সময় দুঃখের কারণ। সম্প্রতি আফ্রিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত যুদ্ধ আক্রান্ত দেশ 'সুদান' নিয়ে ট্রাম্পের আগ্রহ তৈরি হওয়ায় এমনটা ভাবছেন সবাই। আল-জাজিরা, মিডল ইস্ট আই ও মিডল ইস্ট মনিটরের মতো গণমাধ্যমগুলো বলছে– আপাতত মনে হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সুদান। ট্রাম্প তার 'ট্রুথ সোশ্যাল' মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, 'সুদানে ভয়াবহ নৃশংসতা চলছে। এটি একটি মহান সভ্যতা এবং সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত হতো, দুর্ভাগ্যবশত যা এখন খারাপের দিকে গেছে। আমরা সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অংশীদারের সঙ্গে কাজ করব, যাতে এ নৃশংসতা বন্ধ হয় এবং একই সঙ্গে সুদানে স্থিতিশীলতা আসে।'

বাস্তবিকই সুদান প্রাচীন সভ্যতা, নীল নদ এবং পিরামিডের জন্য বিখ্যাত। দেশটির সঙ্গে নীল নদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং জীবন-মৃত্যুর মতো। আসলে নীল নদের দুটো প্রধান শাখার মিলনই ঘটেছে সুদানে। এ কারণে সুদানকে বলা হয় 'নীল নদের জন্মভূমি'। দেশটির রাজধানী খার্তুমে হোয়াইট নাইল ও ব্লু নাইল মিলে এক হয়ে 'নীল নদ' নামে উত্তর দিকে মিসরের দিকে গেছে। মিসরের ৯৭ ভাগ মিঠা পানি আসে, নীল নদ থেকে। আর সেই পানির বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ সুদান ও ইথিওপিয়ার হাতে। এর ফলে ভূরাজনীতিতে দেশটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা, গৃহযুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণে দেশটি বর্তমানে মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি। ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদানের বিচ্ছিন্নতার পর এটি 'উত্তর সুদান' নামে পরিচিত। বর্তমানে সুদানি সশস্ত্র বাহিনী (এসএএফ) এবং র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (আরএসএফ)-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে, যা ২০২৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে। এতে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং মানবিক সংকট তীব্র। ক্ষুধার্তের হাহাকার, ধর্ষিতা নারীর আর্তচিৎকারে সুদানের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। অ্যামনেস্টিসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন থেকে খুবই স্পর্শকাতর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি দারফুর অঞ্চলে প্যারামিলিটারি বাহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যার চিত্র মহাকাশ স্যাটেলাইট থেকেও দৃশ্যমান। এমন সংকটে ট্রাম্পের আবির্ভাবকে অনেকে আশীর্বাদ ও অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা করছেন। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সাম্প্রতিক ওয়াশিংটন সফর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখোমুখি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটির দিকে নতুন করে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে 'সুদান যুদ্ধ'। যদিও হোয়াইট হাউজ দীর্ঘদিন ধরে সুদানের জটিল চ্যালেঞ্জগুলোতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মোহাম্মদ বিন সালমানের সফরের পর এই আগ্রহ আরও তীব্র হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য, লোহিত সাগরে জাতীয় নিরাপত্তা একটি প্রধান উদ্বেগের

ক্ষুধার্তের হাহাকার, ধর্ষিতা নারীর আর্তচিৎকারে সুদানের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। অ্যামনেস্টিসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন থেকে খুবই স্পর্শকাতর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি দারফুর অঞ্চলে প্যারামিলিটারি বাহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যার চিত্র মহাকাশ স্যাটেলাইট থেকেও দৃশ্যমান। এমন সংকটে ট্রাম্পের আবির্ভাবকে অনেকে আশীর্বাদ ও অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা করছেন

বিষয়। মোহাম্মদ বিন সালমানের হস্তক্ষেপের অনুরোধের পর ট্রাম্প এই বক্তব্য দেন যে, সুদান যুদ্ধ 'আমার তালিকায় ছিল না'। এটা যে কৌশলগত পরিবর্তনের চেয়ে সৌদি যুবরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতার ইঙ্গিত, তা সহজেই বোঝা যায়। এর ফলে যুবরাজকে একজন বিশ্বাসযোগ্য আঞ্চলিক নেতা এবং শান্তির দূত হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়েছে। যার ওপর ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে নির্ভর করতে পারে। এটি আঞ্চলিক কূটনীতিতে সৌদি নেতৃত্বাধীন ভূমিকার প্রতি ট্রাম্পের সমর্থনের ইঙ্গিত দেয়। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তার বৃহত্তর আগ্রহের প্রতিফলন ঘটায়। ট্রাম্পের বক্তব্যের পর থেকে এ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা তীব্রতর হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। সুদানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীর সম্পৃক্ততা এবং কোয়াড অংশীদারদের সঙ্গে চলমান সমন্বয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সব বিবেচনায় সুদানের ভবিষ্যৎকে লেনদেনমূলক ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে আবদ্ধ করার ঝুঁকি রয়েছে। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া একটি অর্থবহ সূচনা, কিন্তু সাফল্যের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত প্রয়োগ ব্যবস্থা, সুদানের মালিকানার ওপর ভিত্তি করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তর এবং বিশ্বাসযোগ্য গ্যারান্টি। যদি এই মুহূর্তটি কাজে লাগানো হয়, তাহলে সুদান অবশেষে একটি বেসামরিক নেতৃত্বাধীন ভবিষ্যতের আভাস পেতে পারে। যদি তা না হয়, তাহলে সুযোগটি আবারও ট্র্যাজেডিতে বিলীন হয়ে যেতে পারে। জাতিসংঘ বারবার সুদানকে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুতর মানবিক সংকটের মুখোমুখি হিসেবে বর্ণনা করেছে। পূর্ববর্তী হস্তক্ষেপ জীবন বাঁচাতে পারত। যেমন আরএসএফ বাহিনীর হাতে এল-ফাশারের সাম্প্রতিক পতন। নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ব্যাপক নৃশংসতা রোধ করা এবং একটি মানবিক বিপর্যয় প্রশমিত করা। যার মধ্যে আজ বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্যের অভাব, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর পতন এবং ব্যাপক বাস্তুচ্যুত অন্তর্ভুক্ত। কয়েক সপ্তাহ ধরে কোয়াডের প্রস্তাবিত মানবিক যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এ পরিবর্তন ট্রাম্পের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শান্তি প্রক্রিয়ার ঊর্ধ্বগতির কারণে হতে পারে, অথবা সম্ভবত মার্কিন মধ্যস্থতা গ্রহণের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার কারণে বুরহানকে দেওয়া আশ্বাসের মধ্যে হতে পারে। বুরহানের সৌদি আরব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স-এ পোস্ট করার পর, দেশটির মেরুকরণ নরম হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ এসএএফ সমর্থকরা– সুদানিজ ইসলামিক মুভমেন্টের মহাসচিব আলী কার্তিসহ– স্থিতিশীলতা এবং স্থায়ী শান্তির জন্য নতুন করে আশা প্রকাশ করেছেন। এদিকে আরএসএফ মার্কিন সম্পৃক্ততাকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু 'যারা সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করে' তাদের শান্তিভঙ্গের অভিযোগও করেছে। গোষ্ঠীটি সংকটের মূল কারণগুলো সমাধান করা এবং 'নতুন সুদান' গড়ে তোলার ইচ্ছার ওপরও জোর দিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি আবার দ্রুত পরিবর্তিত হয়, যখন বুরহান ঘোষণা করেন যে, সুদান সংঘাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না। তিনি কোয়াডের শান্তি উদ্যোগকে 'সবচেয়ে খারাপ' হিসেবে বর্ণনা করেন। এরপর সোমবার আরএসএফের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা করা হয়, যেখানে নেতা মোহাম্মদ হামদান দাগালো, যিনি 'হেমেদতি' নামেও পরিচিত, তার দলের তিন মাসের তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির চুক্তি ঘোষণা করেন। এরপর কী হবে তা এখনো অস্পষ্ট।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাম সরাসরি বলেননি। সম্প্রতি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে অনুষ্ঠিত জি-৭ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেছিলেন যে, 'তার সরকার জানে সুদানে নৃশংসতা পরিচালনাকারী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে কারা অস্ত্র সরবরাহ করছে। এ সমর্থন অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত।' সুদানের এল-ফাশেরে নৃশংসতার মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ধর্ষণ এবং হত্যা। স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা যায়, নিহতদের রক্ত রাস্তায় জমাট বেঁধে আছে। বেসামরিক নাগরিকদের মুক্তিপণ হিসেবে ধরে রাখা হয়েছে। নারীদের অপহরণ করা হয়েছে। এল-ফাশেরের গণহত্যার ভয়াবহতা বিশ্ব জুড়ে সরকার এবং জনগণের মনোযোগ সুদান যুদ্ধে ইউএই-এর ভূমিকার দিকে নতুন করে আকর্ষণ করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত আরএসএফকে সমর্থন করার বিষয়টি ক্রমাগত অস্বীকার করছে। কিন্তু স্যাটেলাইট চিত্র, অস্ত্রের সিরিয়াল নম্বর, ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা এবং সুদান ও বাইরের কয়েক ডজন সূত্র এর বিপরীত প্রমাণ সরবরাহ করছে।

যুক্তরাষ্ট্র এখন সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের জন্য বোসাসো ব্যবহার করছে। বোসাসো হলো সোমালিয়ার উত্তর-পূর্বের প্রধান বাণিজ্যিক শহর ও বন্দর, যাকে যুক্তরাষ্ট্র গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষ অভিযানের জন্য কৌশলগত ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। মিডল ইস্ট আইয়ের বিশ্লেষণ করা ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা থেকে জানা যাচ্ছে, মার্চ ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে ৭৭টি ফ্লাইট পুন্টল্যান্ড বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করেছে। এটি প্রমাণ করে, বোসাসো সুদানের দিকে ইউএই-এর 'এয়ার ব্রিজ'-এর একটি স্থায়ী অংশ হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে যুদ্ধরত সুদানের অভ্যন্তরেও ইউএই-এর দুটি ঘাঁটি রয়েছে। দক্ষিণ দারফুরের ন্যালা এবং উত্তর দারফুরের রাজধানী এল-ফাশের থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আল-মালহা। এখন ট্রাম্পের ঘোষণার পর যে তিনি সুদানের দিকে মনোযোগ দেবেন, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে এরই মধ্যে চলমান ক্ষমতার লড়াই আরও তীব্র হওয়ার মঞ্চ তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন– ঐতিহাসিকভাবে, ডোনাল্ড ট্রাম্প সবসময় সৌদি আরবের প্রতিবেশী মুগ্ধ এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। এর বিপরীতে, মার্কিন-সৌদি ঘনিষ্ঠতার দীর্ঘ ঐতিহ্যের বিপরীতে ইউএই-এর প্রতি ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক সন্তুষ্টি কৃত্রিম মনে হয়। আবার বিশ্বের নানা দেশে যুদ্ধ থামিয়ে বারবার নিজেকে নোবেল পাওয়ারযোগ্য ঘোষণাকারী ট্রাম্প, সামনে কী করেন– সেটাই দেখার অপেক্ষা।

CamScanner

Why rumours about Imran Khan's death abound

KHANDAKER AZIZUR RHAMAN

Rumors about the death of former Pakistani Prime Minister Imran Khan have caused huge commotion on social media. When claims spread that he was killed inside Adiala Jail, his sisters protested outside the prison and thousands of supporters gathered. But what is the truth? The Pakistan government and jail authorities have clearly said that Imran Khan is alive and healthy. The source of the rumor appears to be questionable reporting by Indian media. What political motive India may have behind this will become clearer over time.

These reports first appeared in Indian media and later spread across social media. On the morning of 25 November 2025, several Indian news channels reported that Imran Khan had been killed in Adiala Jail by the Pakistan Army. Channels like India Today, Economic Times, India TV and Times of India ran the story based on an unverified post from an Afghanistan based outlet named "Afghan Times." Some channels even ran headlines like "Imran Khan murdered? Death in Adiala Jail." An unverified tweet claiming to be from Balochistan's "Foreign Affairs Ministry" also circulated, saying the ISI had killed him.

Pakistan's Law Minister Aziz Nazir Tanoli said on 26 November, "Imran Khan is alive and well. These rumors are completely false." Adiala Jail authorities also confirmed that Khan is in jail and his health is normal. Because of the rumors, his sisters (Noreen, Aleema and Uzma Khan) protested outside the jail, leading to a clash with police. PTI supporters also tried to push toward the jail but later calmed down.

On X (Twitter), #ImranKhan started trending with hundreds of thousands of posts. Some Pakistani and Afghan accounts shared videos that were actually old footage, such as Khan being injured at a rally in 2013. This increased tension in Pakistan and put pressure on the government. Fact checkers like Alt News reported that the rumor originated in Indian media and then spread on social networks.

Suspicious reporting by Indian media is not new. During periods of India Pakistan tension, such as the 2019 Pulwama incident or the 2025 Kashmir conflict, Indian channels have repeatedly spread unverified claims. In 2019 some channels falsely reported that Islamabad had fallen or that Karachi Port was destroyed. The Imran Khan rumor is another example, where channels used an unverified Afghan post with no disclaimer.

Indian media has a global reputation for spreading false news. Reporters Without Borders ranked India 159th in the 2025 Press Freedom Index, saying political pressure turns media into propaganda. A 2020 report by EU DisinfoLab showed that India had created over 750 fake media sites targeting Pakistan and China.

International analysts say political and geopolitical motives may be behind this kind of reporting. During India Pakistan tension, such news stirs anti Pakistan sentiment among Indian citizens and boosts the popularity of the Modi government. It may also be used to destabilize Pakistan. Imran Khan is a highly popular leader and often critical of the military establishment. Spreading news of his death can create instability, increase public anger and put Pakistan's institutions under pressure, which could give India strategic advantage.

According to the EU DisinfoLab, India runs fake media networks in 116 countries. This damages Pakistan's global image and presents India as a stronger state. Since Imran Khan is hugely popular, rumors about him cause strong reactions in Pakistan, raising tensions along the border and giving India a justification for military readiness.

> *Indian fact checkers like Alt News say this type of sensational reporting targets nationalist emotions and prioritizes ratings over truth.*

Indian fact checkers like Alt News say this type of sensational reporting targets nationalist emotions and prioritizes ratings over truth. Internationally, it strengthens the perception that Indian media acts as a propaganda tool.

Pakistan's government, jail authorities and PTI leaders have all confirmed that Imran Khan is alive. His sister Aleema Khan said they are worried because they haven't been allowed to meet him, but there is no evidence of his death. Although the rumor caused unrest in Pakistan, fact checking has proved it false.

This trend in Indian media appears to serve the interests of a particular political group, harming the credibility of India's democratic image. Globally, it is viewed as an example of information warfare. Pakistan rarely responds with similar fake news campaigns, but such incidents increase hostility and tension between the two countries.

The writer is Head of Photography, The Daily Observer

CamScanner

জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন প্রস্তুতি শূন্য

রাকিব হাসান

বাংলাদেশ ভূগোলগতভাবে এমন এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে প্রকৃতির প্রতিকূলতা যেন দৈনন্দিন জীবনের অংশ। কখনো ঘূর্ণিঝড়, কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো নদীভাঙন প্রতিটি দুর্যোগই যেন আরো তীব্র হয়ে ফিরে আসছে। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যত বাড়ছে, বাংলাদেশের দুর্বলতা তত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উদ্বেগের বিষয় হলো ঝুঁকি বাড়লেও প্রস্তুতির গতি সেই তুলনায় নেই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল আজ যে সংকটে পড়ছে, তা কেবল একটি প্রাকৃতিক সমস্যা নয়। এটি গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকিরও ইঙ্গিত; যার ফলাফল হিসেবে অপেক্ষা করছে মারাত্মক দুর্ভিক্ষসহ নানা বিষয়। দেশের বর্তমান আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। যার বড় কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন। অতিরিক্ত গরম, অতি বৃষ্টি ও প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ চিন্তার বিষয়। যেমন, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততার বিস্তার কৃষিজ উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নোনাজলে ধান, সবজি বা ফল উৎপাদন কঠিন হয়ে পড়েছে। উত্তরে খরা, মাঝাঞ্চলে নদীভাঙন, হাওর অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা মিলিয়ে প্রতিটি অংশ যেন জলবায়ুর ভিন্ন ভিন্ন আঘাতে আক্রান্ত। এদিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে নগরজীবনও হয়ে উঠছে কঠিন। গত কয়েক বছরে ঢাকার তাপমাত্রা রেকর্ড ভেঙে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। সামান্য বৃষ্টিতেই শহর জলাবদ্ধ হয়ে পড়ছে, যা অবকাঠামোগত দুর্বলতার স্পষ্ট প্রতিফলন।

> দেশের বর্তমান আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। যার বড় কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন। অতিরিক্ত গরম, অতি বৃষ্টি ও প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ চিন্তার বিষয়

কাগজে কলমে বাংলাদেশের জলবায়ু অভিযোজন কৌশল প্রশংসনীয়। বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে। তবে বাস্তবতায় দেখা যায় সমন্বয়ের অভাব, দীর্ঘমেয়াদি চিন্তার ঘাটতি এবং মাঠপর্যায়ে দুর্বল বাস্তবায়ন। ফলে দুর্যোগ মোকাবেলায় যে সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, তা এখনো সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হয়নি। জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনে প্রস্তুতি শূন্য ই বলা যায়।

বিশ্বে প্রতি বছর জলবায়ু সম্মেলন আয়োজিত হয়। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন ২১০০ সালের দিকে বিশ্বের প্রায় ৪৩ টি দেশ পরিপূর্ণ ভাবে সমুদ্রের নিচে চলে যাবে। বাংলাদেশের একটি বড় অংশ ডুবে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এসবের কারণ হিসেবে দায়ী দেশ সমূহ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও রাশিয়া পৃথিবীব্যাপী ৫৫ শতাংশেরও বেশি কার্বন নিঃসরণ করছে। অন্যদিকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর দায় একেবারেই নগণ্য। বাংলাদেশের দায় তো এ ক্ষেত্রে মাত্র ০.৪৭ শতাংশেরও কম। কিন্তু কার্বন নিঃসরণ এর ভয়াবহতার স্বীকার হচ্ছে বাংলাদেশের মত দেশ সমূহ ই। জলবায়ু সম্মেলন "কপ" প্রতিবছর আয়োজিত হয় উন্নত ও কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী দেশগুলোর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর জন্য আর্থিক ও অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য। যেখানে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ ২৮ এ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে Locally Led Adaptation (LLA) উদ্যোগের জন্য। গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশন বাংলাদেশকে "Local Climate Leadership Award" প্রদান করেছে। স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রকল্পটি স্থানীয় জলবায়ু সহনশীলতা গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন, ডেনমার্ক, ইউএনডিপি এবং ইউএনসিডিএফ-এর সহায়তায় পরিচালিত এই প্রকল্প ইতোমধ্যে প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষ কে জলবায়ু অভিযোজনের সুযোগ দিয়েছে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জেলাগুলোতে প্রায় ৪ লাখ পরিবার টেকসই জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়েছে যা দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বাড়ানোর একটি দৃষ্টান্ত।

তবে বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেলেও বাস্তবে দেশের প্রস্তুতি যে এখনো দুর্বল, তা একাধিক সূচকেই স্পষ্ট। শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা, নদীভাঙনে বাস্তুচ্যুত মানুষ, কৃষিজ উৎপাদন কমে যাওয়া এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি এসব থেকে বোঝা যায়, সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। কেবল আন্তর্জাতিক পুরস্কার বা ঘোষণা দিয়ে ঝুঁকি কমবে না। এতে প্রয়োজন বাস্তবসম্মত, দীর্ঘমেয়াদি ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা।

বাংলাদেশকে এখনই যে দিকগুলোতে গুরুত্ব দিতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম কৃষিতে জলবায়ু সহনশীল জাত উদ্ভাবন, টেকসই নগর পরিকল্পনা, নদী ও জলাধার রক্ষা, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। পাশাপাশি দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনকে আরও পদ্ধতিগতভাবে শক্তিশালী করতে হবে। যাতে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়। বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যা আমাদের গর্ব। কিন্তু দেশের ভেতরের বাস্তবতা পাল্টাতে হলে স্বীকৃতির পাশাপাশি কাঠামোগত উন্নয়ন এবং জনসম্পৃক্ততাই সবচেয়ে বড় শক্তি। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি যে গতিতে বদলে যাচ্ছে, আমাদের প্রস্তুতি সেই গতিতে এগোচ্ছে না এটাই সবচেয়ে বড় উদ্বেগ।

জলবায়ুর বিশাল পরিবর্তন এখন এক কঠিন সত্য। কপ-এ বাংলাদেশের অর্জন আশাব্যঞ্জক হলেও মাটির বাস্তবতায় প্রস্তুতি এখনো তেমন সন্তোষজনক নয়। তাই সরকারের উদ্দীপনামূলক বক্তব্য নয় প্রয়োজন বাস্তব কাজ। শুধু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নয় প্রয়োজন প্রস্তুতি। প্রয়োজন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন।

লেখক: শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা কলেজ

CamScanner

ঋণনির্ভর উন্নয়ন
চ্যালেঞ্জ ও বিশ্ব অভিজ্ঞতা

ড. মো. আইনুল ইসলাম

বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান গতিপথ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারি ঋণের পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু সেই অনুপাতে রাজস্ব আয় এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি থমকে আছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য একটি গভীর কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কেবল আর্থিক ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয় না, বরং এটি উন্নয়নের মানসিকতা এবং রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারের দিকেও প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। ২০২৫ সালের জুনে সরকারের মোট ঋণ ২১ লাখ ৪৪ হাজার ৩৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা গত এক বছরে প্রায় ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এই ঋণের স্থিতি বেড়েছে প্রায় ১৫ লাখ ৫৮ হাজার কোটি টাকা। সরকারের ঋণভার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধির এই প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে এবং এর টেকসই সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে বিশ্ব অর্থনীতির দুটি প্রধান শক্তি-চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের- ঋণ গ্রহণ ও উন্নয়ন কৌশল বিচার করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশের আর্থিক কাঠামোগত দুর্বলতার উৎস ও ঋণের চাপ

বাংলাদেশে সরকারি ঋণের দ্রুত বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে দুর্বল রাজস্ব আহরণ, বিনিয়োগে মন্দা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা। মোট ঋণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রায় ১১ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ ৯ লাখ ৪৯ হাজার কোটি টাকা। এই ঋণের পরিমাণ জিডিপির অনুপাতে এখনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সীমার মধ্যে থাকলেও, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা এবং রাজস্ব আয়ের দুর্বলতার কারণে ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের দুর্বল রাজস্ব ভিত্তি থেকে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত সর্বনিম্ন, যা মাত্র ৭ থেকে ৭.৫ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর এই নির্ভরতা অর্থনীতির জন্য গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বয়ে আনছে। সরকার ট্রেজারি বিল ও বন্ডের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো থেকে বেশি ঋণ নেওয়ায়, বেসরকারি খাতে ঋণ সংকুচিত হচ্ছে, যা অর্থনীতির ভাষায় ক্রাউডিং আউট নামে পরিচিত। বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করায় সুদের হার রয়েছে উচ্চপর্যায়ে। ফলে নতুন বিনিয়োগের অভাব দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২৫ সালের জুলাই মাসের শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নেতিবাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগের এই স্থবিরতা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে না এবং অর্থনীতির উৎপাদনশীল চাকা মন্থর হয়ে আসছে। এই পরিস্থিতিতে নেওয়া ঋণ ভবিষ্যতের আয় সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়ে কেবল দায়ের পাহাড় তৈরি করছে। ঋণ বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে সুদ পরিশোধের বোঝাও। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকার সুদ বাবদ পরিশোধ করেছে ১ লাখ ৩২ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি। দেশীয় ঋণের সুদ ১৬ শতাংশ এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি এই প্রবণতা চলতে থাকে, তবে ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে সুদ পরিশোধই দেশের বাজেটের বৃহত্তম একক ব্যয় খাত হয়ে উঠবে, যা উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারের ব্যয় করার ক্ষমতাকে নিশ্চিতভাবে সীমিত করবে।

এডিপি স্থবিরতা ও ঋণের অনুৎপাদনশীল ব্যবহার

বাংলাদেশের বর্তমান ঋণ সংকটের গভীরতা কেবল ঋণের পরিমাণের মধ্যে নিহিত নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে ঋণের অনুৎপাদনশীল ব্যবহার এবং

উন্নয়ন মানসিকতার দুর্বলতা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন হার ৬৮ শতাংশের নিচে নেমে আসে, যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। জুলাই থেকে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন হার ৮.৩৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের (৭.৯০ শতাংশ) চেয়ে সামান্য বেশি হলেও, টাকার অংকে ব্যয় কমেছে। এই স্থবিরতার প্রধান কারণ ছিল, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা নতুনভাবে মূল্যায়ন করা। বহু প্রকল্প বাদ দেওয়া হয়েছে বা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। এ প্রবণতা ইঙ্গিত করে, পূর্ববর্তী সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচনে অর্থনৈতিক উপযোগিতার চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনা বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল, যা উন্নয়ন প্রশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকে প্রতিফলিত করে। তবে উন্নয়ন ব্যয় কমানো সত্ত্বেও ঋণের ওপর নির্ভরতা কমেনি, যার অর্থ হলো ঋণের অর্থ এখন সরাসরি উৎপাদনশীল অবকাঠামো নির্মাণ বা প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে রাজস্ব ঘাটতি মেটানো ও সুদ পরিশোধের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ধরনের ঋণ টেকসই হয় না, বরং তা দ্রুত ঋণ পরিশোধের সক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণকে এখন 'মধ্যম-ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে মূল্যায়ন করছে। এই রেটিং অবনমনের প্রধান কারণ হলো ঋণ-রপ্তানি অনুপাত, যা ১৬২ শতাংশ এবং এটি নিরাপদ সীমার অনেক ওপরে। এই চ্যালেঞ্জের সবচেয়ে বড় দিকটি হলো আসন্ন ঋণ পরিশোধের চাপ। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) হিসাব অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ সাল থেকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো মেগা প্রকল্পগুলোর জন্য নেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ দ্রুত বাড়বে, যা ২০৩৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যদিও রাশিয়া পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে সৃষ্ট অর্থপ্রদানের জটিলতা নিরসনে, রূপপুর প্রকল্পের মূল ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা মার্চ ২০২৭ থেকে পিছিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে এবং এটি ২০ বছর ধরে পরিশোধের সুযোগ দিয়েছে। তবে এটি সাময়িক স্বস্তি। ফলে ঋণের মূল বেদনা অনুভব করা অনিবার্য, আগামীতে দেশের অর্থনীতির সংকট তীব্রতর করবে।

চীনের উন্নয়ন দর্শন

চীনের উন্নয়নের মানসিকতা ঐতিহাসিকভাবে বৃহৎ আকারের, ঋণ-সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা চালিত। গত চার দশকে চীন বিশাল অভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিল্পে বিনিয়োগ করে নিজেদের শক্তিশালী করেছে। ২০২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, চীনের সরকারি ঋণ-জিডিপি অনুপাত প্রায় ৭৭ শতাংশ, যা তুলনামূলকভাবে উচ্চ হলেও, তাদের উচ্চ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এই চাপ বহন করতে সক্ষম। বেইজিং বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) মাধ্যমে চীন বিশ্বজুড়ে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃহত্তম বিদেশি সরকারি ঋণদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো একে ঋণ ফাঁদ কূটনীতি হিসেবে অভিহিত করলেও, চীন এই উদ্যোগকে 'উভয় পক্ষের জয়' নিশ্চিতকারী সহযোগিতা হিসেবে দেখে।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যতিক্রমী কৌশল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ গ্রহণ এবং উন্নয়ন মানসিকতা চীনের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ব্যতিক্রমী, যা মূলত ডলারের বৈশ্বিক রিজার্ভ কারেন্সি মর্যাদার ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বের সর্বোচ্চ সরকারি ঋণের বোঝা বহন করা সত্ত্বেও (২০২৫ সালে যা জিডিপির প্রায় ১৩০ শতাংশ), যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বেশ সহনশীল ও শক্তিশালী ভাব দেখায়। এই ভাব দেখানোর ভিত্তি হলো ডলারের 'অতিরিক্ত সুবিধা'। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডলারের বৈশ্বিক মর্যাদা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণের সহনশীলতার স্তরকে প্রায় ২২ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব মুদ্রায় বিপুল পরিমাণ ঋণ নিতে পারে। ফলে সুদের হার কম থাকে এবং মুদ্রা অবমূল্যায়নের ঝুঁকি থাকে না। বাংলাদেশের মতো যেসব দেশ বৈদেশিক ঋণ প্রধানত ডলারে করে, তাদের জন্য রপ্তানি আয় না বাড়লে এই সুবিধা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে এবং ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ঋণের ব্যবহার প্রধানত প্রতি-আবর্তনমূলক আর্থিক নীতির সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক মন্দা বা দুর্বলতার সময় সরকার ব্যয় বৃদ্ধি বা কর কমানোর জন্য ঋণ নেয়, যাতে সামগ্রিক চাহিদা উদ্দীপিত হয়। এটি অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত পথরেখা

চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ গ্রহণ ও উন্নয়ন মানসিকতা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের জন্য স্পষ্ট কৌশলগত পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেই ঋণ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে না এবং রাজস্ব ভিত্তি দুর্বল। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করতে হবে- ঋণের গুণগত মান বৃদ্ধি করা এবং রাজস্ব সক্ষমতা জোরদার করা। কৌশলগত পথরেখা কার্যকর করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা অপরিহার্য। কেননা, বাংলাদেশের বর্তমান ঋণনির্ভর উন্নয়ন মডেলটি অত্যন্ত নাজুক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্যায়ন স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে, রাজস্ব আহরণে দুর্বলতা, বিনিয়োগ স্থবিরতা এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্থরতা যদি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে দেশের ঋণচাপ আগামী বছরগুলোতে আরও তীব্র হবে।

মনে রাখতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অতিরিক্ত সুবিধা' এবং চীনের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন উৎপাদনশীল মডেল্ড কোনোটিই বাংলাদেশের জন্য সরাসরি অনুসরণযোগ্য না হলেও, উভয় মডেলের সফল উপাদানসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের এখন দ্রুত রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি, ঋণ ব্যবস্থাপনায় আধুনিকীকরণ এবং ঋণ গ্রহণে কঠোর কৌশলগত বাছাইয়ের মাধ্যমে কেবল রপ্তানি এবং উৎপাদনসহায়ক প্রকল্পে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। যদি সময়মতো কৌশলগত এসব পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে ২০২৬-২৭ সাল থেকে শুরু হতে যাওয়া বড় আকারের বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধের চাপ মোকাবিলা করা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াবে। যা দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির গতিকে গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত করবে।

লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner